দৈনিক
বজ্রশক্তি
অন্যায়ের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর

মে সংখ্যা ২০১৫

সংকলন

রেজিঃ ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-০৫।
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ । মে ২০১৫ । রজব ১৪৩৬ । ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

থাকবে না আর কোনো অবিচার, সকলে মিলে যদি হই এক পরিবার।

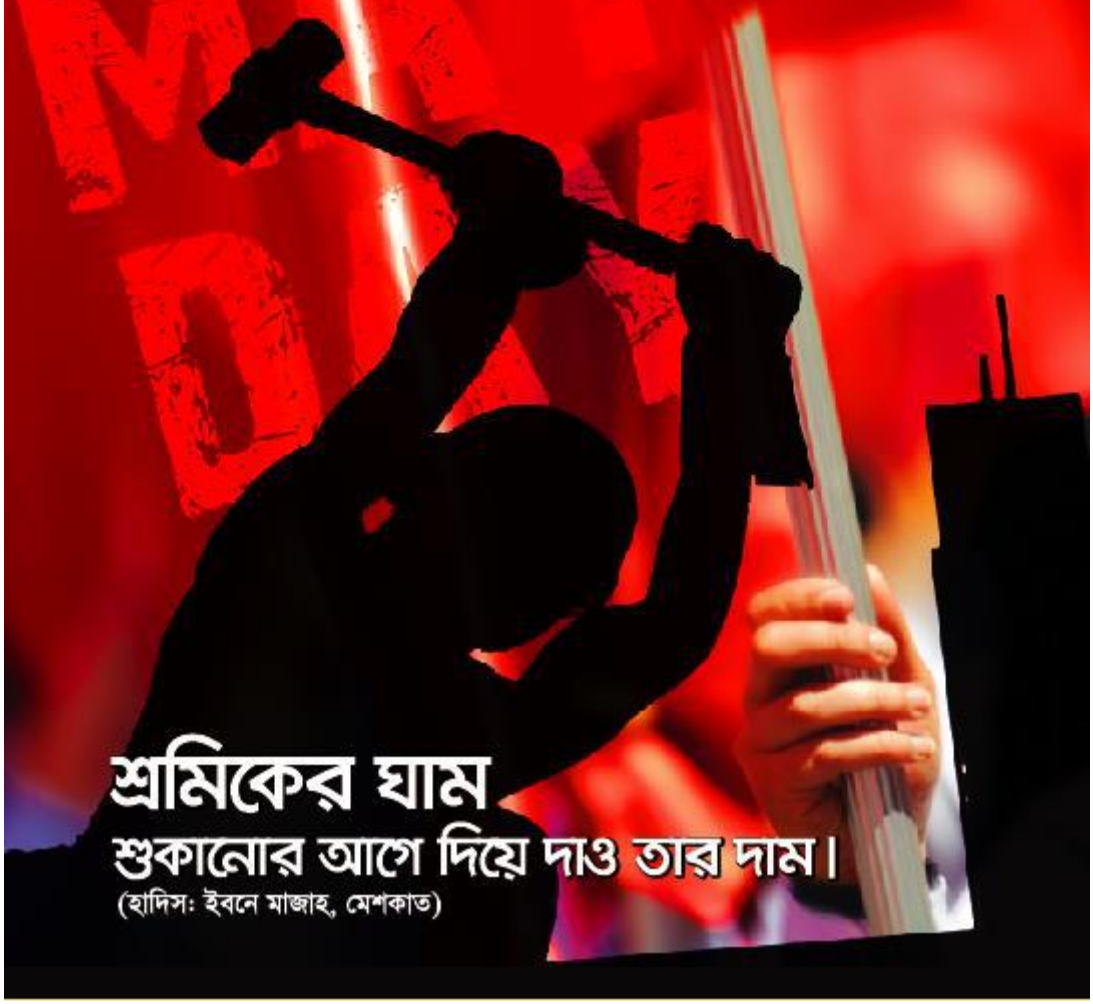

শ্রমিকের ঘাম
শুকানোর আগে দিয়ে দাও তার দাম।
(হাদিস: ইবনে মাজাহ, মেশকাত)

সম্পাদকীয়

নবনির্মাণের সূচনাকারীদের সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে

আজ সমস্ত পৃথিবী অন্যায়, অবিচার আর অশান্তিতে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর চারদিক থেকে আর্ত-মানুষের হাহাকার উঠছে- শান্তি চাই, শান্তি চাই। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের উপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের উপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের উপর ধূর্তের বঞ্চনায়, পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। নিরপরাধ ও শিশুর রক্তে আজ পৃথিবীর মাটি ভেজা। সমস্ত দিক দিয়ে মানুষ অপরাধের সীমা অতিক্রম করেছে, ফলে পৃথিবী অশান্তির অগ্নিগোলকে পরিণত হয়েছে। সুতরাং যে সিস্টেম, যে জীবনব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এই অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে সেই পাশ্চাত্য, বস্তুবাদী, স্রষ্টাহীন দাজ্জালীয় 'সভ্যতা' ও এই সভ্যতা ধারণকারী সকল মনুষ্য সমাজের ধ্বংস প্রাকৃতিক কারণেই অত্যাসন্ন।

মেকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.) বলেন, তিনি রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছেন যে, ভূপৃষ্ঠে এমন কোনো মাটির ঘর বা তাবু থাকবে না যেখানে আল্লাহ ইসলাম পৌঁছে দিবেন না- সম্মানীর ঘরে সম্মানীর সাথে এবং অসম্মানীর ঘরে অসম্মানের সাথে। অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন, তাদেরকে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের যোগ্য করে দিবেন। আর যাদেরকে তিনি অসম্মানিত করবেন তারা জিযিয়া দিয়ে এ দ্বীনের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হবে। আমি বললাম, তাহলে তো দীন পূর্ণভাবে আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। [মুসনাদ ইবনে আহমাদ, মেশকাত শরীফ]

সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত হওয়া ও পৃথিবী থেকে সমস্ত মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়া, স্রষ্টাহীন বস্তুবাদী প্রচলিত এই দাজ্জালীয় সভ্যতার ধ্বংস হওয়া তো একই বিষয়। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে আল্লাহর নবী ঈসা (আ.) এসে এই কাজটিই করবেন। অনেক হাদীসেই এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়। খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারীরাও বিশ্বাস করে যে যিশু খ্রিষ্ট তথা ঈসা (আ.) পৃথিবীতে আসবেন এবং সমস্ত পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন ও পৃথিবীকে 'কিংডম অব হ্যাভেন' তথা স্বর্গরাজ্য বানাবেন। বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে- "এর পরে মসীহ যখন সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা, অধিকার আর ক্ষমতা ধ্বংস করে আল্লাহর হাতে রাজ্য দিয়ে দেবেন (পূর্ণরূপে আল্লাহর সার্বভৌত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে) তখনই শেষ সময় আসবে।" [সপ্তম সিপারা (১ করিন্থীয়)- ১৫:২৪] অর্থাৎ কিংডম অব হ্যাভেনের পূর্বে এই ঘুণে ধরা সমাজব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য।

মহাভারতে বর্ণিত আছে, "সমাজে যখন করুণার নাশ হয় তখন সমাজ স্বয়ং নিজের জন্য যুদ্ধ প্রস্তুত করে থাকে"। আজ সমাজ থেকে সমস্ত করুণা উঠে গেছে। ভাই ভাইকে হত্যা করছে, সন্তান পিতা-মাতাকে কষ্ট দিচ্ছে, পিতা-মাতা সন্তানের ধ্বংস কামনা করছে, পুরুষ স্ত্রীলোকের সম্মানহানি করছে, করুণার অভাবে পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে, আলগা হয়ে যাচ্ছে রক্তের বন্ধন- এভাবে সামাজ চলতে পারে না। অবশ্যই প্রকৃতি নিজের জন্য মহাবিধ্বংস ডেকে আনছে। এখন সেই বিধ্বংসের পশ্চাতে কে সফল হবে আর কে বিধ্বংসের বলি হবে সেটা নির্ভর করছে প্রতিটা মানুষের নিজ নিজ কর্মের উপর আর সিদ্ধান্তের উপর। বিধ্বংসের পর নবনির্মাণের আরম্ভ হবে, সত্যযুগ ফিরে আসবে, কিংডম অব হ্যাভেন প্রতিষ্ঠিত হবে, ইসলামের স্বর্ণযুগের পুনরাবির্ভাব হবে।

মহাবিধ্বংসের পর যারা নবনির্মাণের সূচনাকারী হবে তাদের অবশ্যই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। সেই সত্য মহান আল্লাহ অতি দয়া করে, করুণা করে মাননীয় এমামুয্‌যামানের মাধ্যমে হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। সেই সত্যগুলি আমরা গত ২০ বছর ধরে অনবরত মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। এই সংকলন সেই সত্য প্রচারের এক হাতিয়ার।

সূচিপত্র

- *অধরাই রয়ে গেছে শ্রমিকের অধিকার-২*
- *জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব- ৪*
- *সমাজের ধ্বংস, প্রচলিত ব্যবস্থার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী!- ৮*
- *প্রকৃত সাম্যবাদীরা আসুন পথ পাওয়া গেছে-৯*
- *মৌনতাই আলেমদের বর্তমান হীনতার কারণ-১১*
- *ইসলাম শিক্ষার নামে যা হচ্ছে- ১৩*
- *জান্নাতি ফেরকা: মৃত জাতির আশার আলো- ১৪*
- *ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড- ১৬*
- *হেযবুত তওহীদের বালাগ-১৯ দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে আয়োজিত 'ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান' শীর্ষক আলোচনা সভার খণ্ডচিত্র-২৪*
- *তওহীদ জান্নাতের চাবি-২৬*
- *নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য- ২৯*
- *একটি জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয় কখন?- ৩১*

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মিডিয়া প্রিন্টার্স, ৪৪৬/এইচ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টাগুলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

মে দিবসের কথা ■ আতাহার হোসাইন

অধরাই রয়ে গেছে শ্রমিকের অধিকার

মে মাসের প্রথম দিনটিকে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে গণ্য করা হয়। আবার বিশ্বের কিছু কিছু দেশে এ দিনটিকে 'লেবার ডে' হিসাবেও পালন করা হয়। বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশেই এ দিনটি সরকারিভাবে ছুটি পালন করা হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় এ দিনটি পালিত হয় না। আগে শ্রমিকদের অমানবিক পরিশ্রম করতে হত, প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা আর সপ্তাহে ৬ দিন। বিপরীতে মজুরি মিলত নগণ্য, শ্রমিকরা খুবই মানবেতর জীবনযাপন করত, ক্ষেত্রবিশেষে তা দাসবৃত্তির পর্যায়ে পড়ত। ১৮৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের একদল শ্রমিক দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজ করার জন্য আন্দোলন শুরু করে এবং তাদের এ দাবি কার্যকর করার জন্য তারা সময় বেঁধে দেয় ১৮৮৬ সালের ১লা মে। কিন্তু কারখানা মালিকগণ এ দাবি মেনে নিল না। ৪ঠা মে ১৮৮৬ সালে সন্ধ্যাবেলা হালকা বৃষ্টির মধ্যে শিকাগোর 'হে'-মার্কেট নামক এক বাণিজ্যিক এলাকায় শ্রমিকগণ মিছিলের উদ্দেশ্যে জড়ো হন। তারা ১৮৭২ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত এক বিশাল শ্রমিক শোভাযাত্রার সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এটি করেছিলেন। আগস্ট স্পীজ নামে এক নেতা জড়ো হওয়া শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলছিলেন। এমন সময় হঠাৎ দূরে দাঁড়ানো পুলিশ দলের কাছে এক বোমার বিস্ফোরণ ঘটে, এতে এক পুলিশ নিহত হয়। পুলিশবাহিনী তৎক্ষণাৎ শ্রমিকদের উপর অতর্কিতে হামলা শুরু করে যা পরবর্তীতে রায়টের রূপ নেয়। রায়টে ১১ জন শ্রমিক নিহত হয়। পুলিশ হত্যা মামলায় আগস্ট স্পীজসহ আটজনকে অভিযুক্ত করা হয়। এক প্রহসনমূলক বিচারের পর ১৮৮৭ সালের ১১ই নভেম্বর উন্মুক্ত স্থানে ৬ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। লুইস লিং নামে একজন একদিন পূর্বেই কারাভ্যন্তরে আত্মহত্যা করে, অন্য একজনের পনের বছরের কারাদণ্ড হয়। ফাঁসির মঞ্চে আরোহণের পূর্বে আগস্ট স্পীজ বলেছিলেন, "আজ আমাদের এই নিঃশব্দতা তোমাদের
আওয়াজ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হবে"। ২৬শে জুন, ১৮৯৩ ইলিনয়ের গভর্নর অভিযুক্ত আটজনকেই নিরপরাধ বলে ঘোষণা দেয় এবং রায়টের হুকুম প্রদানকারী পুলিশের কমান্ডারকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। আর অজ্ঞাত সেই বোমা বিস্ফোরণকারীর পরিচয় কখনোই প্রকাশ পায় নি। শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের দৈনিক আট ঘণ্টা কাজ করার দাবি 'অফিসিয়াল'ভাবে স্বীকৃতি পায়। আর পহেলা মে বা মে দিবস প্রতিষ্ঠা পায় শ্রমিকদের দাবি আদায়ের দিন হিসেবে। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের উক্ত গৌরবময় অধ্যায়কে স্মরণ করে ১৯৮০ সাল থেকে প্রতি বছরের ১লা মে বিশ্বব্যাপী পালন হয়ে আসছে 'মে দিবস' বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস'। ১৮৯০ সালের ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কংগ্রেসেও ১ মে শ্রমিক দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং তখন থেকে

অনেক দেশে দিনটি শ্রমিক শ্রেণি কর্তৃক উদযাপিত হয়ে আসছে। রাশিয়াসহ পরবর্তীকালে আরো কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পর মে দিবস এক বিশেষ তাৎপর্য অর্জন করে। জাতিসংঘে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক শাখা হিসাবে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা অরগানাইজেশন (আই.এল.ও) প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের অধিকারসমূহ স্বীকৃতি লাভ করে এবং সকল দেশে শিল্প মালিক ও শ্রমিকদের তা মেনে চলার আহ্বান জানায়। বাংলাদেশ আই.এল.ও কর্তৃক প্রণীত নীতিমালায় স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। ঘটনা যেহেতু ঘটেছিল পুঁজিবাদী যুক্তরাষ্ট্রে, কাজেই পুঁজিবাদী বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণির প্রাধান্যের কারণে অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক দেশে বেশ গুরুত্ব সহকারে মে দিবস পালন করা হয়ে থাকে।

শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষায় এত ঢাকঢোল পেটানো, এত আয়োজন হলেও সত্যিকার অর্থে কতটা মুক্তি পেয়েছে বিশ্বের খেটে খাওয়া, ঘাম ঝরানো শ্রমিক সম্প্রদায়- এ প্রশ্ন খুব বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে আজ পৃথিবীবাসীর সামনে। ১০০ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলো শ্রমিকের মুক্তির আশ্বাসে পেটানো ঢোল। এতে ঢোলেরই যা ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে শুধু। আজও শ্রমিক আঠারো ঘণ্টা কাজ করে মরে কারখানার ধোঁয়া আর কালিতে। অল্প বয়সে রোগে ভুগে, জরাজীর্ণ হয়ে ধুকে ধুকে মরে এই শ্রমিকেরা। এখনো জোর করে বাধ্য করা হয় কাজ করতে। বিনিময়ে কি পায় তারা? কতটুকু পেলো মর্যাদা? প্রায় শতবছর আগে বাংলাদেশের 'বিদ্রোহী কবি' তার কবিতায় বর্ণনা করে গিয়েছিলেন তৎকালীন শ্রমিকদের অবস্থা। 'কুলি মজুর' কবিতায় তিনি সখেঁদে বলেছিলেন:

"দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিল নিচে ফেলে-
চোখ ফেটে এলো জল,
এমনি করে কি জগত জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল?
যে দধীচিদের হাড় দিয়া ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সাব এসে চড়িল তাহাতে, কুলিরা পড়িল তলে।"

আবার,

"বল তো এসব কাহাদের দান !
তোমার অট্টালিকা,
কার খুনে রাঙ্গা?-
ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা।
তুমি জান নাকো কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকনা জানে,
ঐ পথ ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে !"

সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক, যতই বাড়ুক হাইটেক প্রযুক্তি, উঁচু উঁচু দালান কোঠা- কিন্তু বাড়ে নি মানবতা। শ্রমিক ফিরে পায় নি তার যথাযথ মূল্যায়ন। মানসিকতার দিক দিয়ে আজও সভ্য মানুষেরা প্রাচীন দাস যুগেই রয়ে গেছে। তাই লোক দেখানো দিবস পালনের আড়ালেই শুকিয়ে যাচ্ছে শ্রমিকের ঘাম আর খুন। শ্রমিক হারাচ্ছে তার ন্যায্য পাওনাটুকু। পুঁজিবাদী প্রতারণার অর্থব্যবস্থা শ্রমিককে পরিণত করেছে আধুনিক দাসে। শ্রমিক শ্রেণিকে নিয়ে নর্তন-কুর্দন করা সমাজতন্ত্রও কিছুই করতে পারে নি শ্রমিকদের জন্য। বাস্তবে তারাও শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। শ্রমের বিনিময়ে দু'টুকরো রুটির জন্য দাঁড়াতে হতো লাইনে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সেখান থেকে মানুষ পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিল। পালাতে গিয়ে তারা দেশের সীমানা প্রাচীর রেলগাড়ির ইঞ্জিন দিয়ে ঠেলে ভেঙ্গে দেশ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। অনেকে প্রিয় মাতৃভূমির মায়া চিরতরে ত্যাগ করে ছোট্ট নৌকায় ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি সংখ্যায় আরোহণ করে পাড়ি দিতে গিয়ে ডুবে মরেছে অথৈ সাগরে। কি দিলো সমাজতন্ত্র? দিয়েছে শান্ত্বনার একটি দিবস। হ্যাঁ, পাশাপাশি পুঁজিবাদী গণতন্ত্র দিয়েছে শ্রমিকদের বিক্ষোভ প্রকাশের জন্য নিজের পছন্দমত একটি ব্যবস্থা। সেটা হচ্ছে শ্রমিক ইউনিয়ন করার অধিকার, মে দিবসের ছুটিতে গালভরা বুলি আওড়ানোর জন্য কিছু সভা-সেমিনার করার সুযোগ। প্রচলিত সিস্টেম বা জীবন পদ্ধতি এটা করেছে মালিক পক্ষ ও শ্রমিকদের মধ্যে একটি স্থায়ী ভুল বোঝাবুঝি, অসন্তোষের পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখার জন্য, একে অপরের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করানোর জন্য। একদিকে শ্রমিকদের অধিকার দেয়া হয়েছে ইউনিয়ন করার, আন্দোলন করার, অপরদিকে মালিককে চাপে ফেলানো হচ্ছে দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করতে। মালিকরা যদি শ্রমিক ইউনিয়নের চাপ, অসহযোগ আন্দোলন, লক-আউট ইত্যাদি কারণে তাদের দাবি দাওয়া মেনেও নেয়, মজুরি বৃদ্ধি করে- ওদিকে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলো সাথে সাথে যাতায়াতভাড়া, গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দেয় এবং ব্যবসায়ীরা বাড়িয়ে দেয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য। বেতন বাড়লো তো সবকিছুর দাম বাড়লো। ফলে শ্রমিকের মজুরি দু' টাকা বাড়লে ব্যয় বাড়ে চার টাকা। এভাবেই আবর্তিত হয় শোষণের চক্র, আবার ঘুরে ঘুরে ফিরে আসে 'মে' দিবসের প্রহসন। সেই সাথে মালিক পক্ষের অতি মুনাফালোভী ভূমিকার কারণে শ্রমিক আজও মরে কারখানায় আগুন লেগে, ভবন ধসে, কলে চাপা পড়ে। কাগজে কলমে বড় বড় সংস্থা ও কর্তৃপক্ষ দেখায় ৮ ঘণ্টার বেঁধে দেয়া কাজের সময়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে আজও তাদের খেটে মরতে হয় দিনে আঠারো ঘণ্টারও বেশি। হাড় জিরজিরে এই শ্রমিকের ঘাড়েই চেপে আছে প্রভুদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ যোগানের দায়িত্ব। তারপরেও প্রভুদের আরাম আয়েশ আর বিলাসিতাকে আরো নিশ্চিদ্র করতে ছাঁটাই করা হয় সাধারণ শ্রমিকদের। তাহলে শত বছর পেরিয়ে যাওয়া এই

মে দিবসের নেট ফল কী? যারা এই দিবসের ঢোল পিটাচ্ছে সজোরে, খোদ তাদের দেশেই আজ শ্রমিক অসন্তোষ বাড়ছে ব্যাপক আকারে। আগে হয়তো বিক্ষোভে জমায়েত হতো শত শত মানুষ, আর আজ জমায়েত হয় লাখে লাখে। একবিংশ শতাব্দীতেও ফ্রান্স, গ্রিস, স্পেন, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, ইংল্যান্ড উত্তাল হয় শ্রমিকের ক্ষোভে। দিনের পর দিন চলতে থাকা এই বিক্ষোভে শাসকের জল কামানের গরম পানির তোড়ে ভেসে যায় শ্রমিকের অধিকার নামের অধরা বস্তুটি। তাহলে কী দিলো এই দিবস?

সভ্যতার গর্ব যে অবকাঠামো, দালান কোঠা, চোখ জুড়ানো নান্দনিক স্থাপত্য, সেতু- কার শ্রম দিয়ে গড়া এই সব? যার শ্রমে গড়া সেই শ্রমিকের নাম কি খুঁজে পাওয়া যায় কোথাও? একবারও কি উচ্চারিত হয় তা? তাই বার বার মে দিবস এসে মনে করিয়ে দিয়ে যায় শ্রমিকের না পাওয়ার কথা, বঞ্চনা আর শোষণের কথা। মে দিবস এসে মনে করিয়ে দিচ্ছে সেই শ্রমিকের অশ্রু জড়ানো রানা প্লাজা ধ্বসের কথা। মাত্র কয়েকদিন আগে ২ বছর পূর্তি হয়েছে রাজধানীর অদূরে সাভারে একটি নয়তলা পোশাক কারখানা 'রানা প্লাজা' ধ্বসে পড়ার।

ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও জোর করে এখানে শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছিল। কিন্তু যখন ৯ তলা ভবনটি ধ্বসে পড়ে তখন এতে চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটে ১২ শতাধিক শ্রমিকের। নিখোঁজের সংখ্যা এখনও দেড় শতাধিক। দীর্ঘ দিন উদ্ধারাভিযান চালিয়েও তাদের মৃতদেহের সন্ধান মেলেনি। আর হাত-পা বিহীন বিকলাঙ্গের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। তাদের স্বজনরা এখনো তাদেরকে নিয়ে সীমাহীন যন্ত্রনায় পোহাচ্ছে। অনেক পরিবার পথে বসেছে। প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্য নিয়েও অভিযোগের সীমা নেই। এভাবেই কালে কালে অধরা রয়ে গেছে শ্রমিকের প্রকৃত মুক্তি, শ্রমের মর্যাদা। সভ্যতার ধ্বজাধারীরা কি আপসে তাদের ভোগবিলাস পরিত্যাগ করে, অন্যায়- অন্যায্য নীতিকে বর্জন করবে? কিন্তু কবি তো বলে গেছেন,

"আসিতেছে শুভদিন,
দিনে দিনে বহু বাড়িয়েছে দেনা, শুধিতে হইবে ঋণ!"?

প্রশ্ন হলো কে এনে দেবে তাদের এই শুভদিন? যারা প্রকৃতপক্ষে মূল্যায়ন করবে তাদের- কোথায় তারা? কোন ব্যবস্থা দিবে তাদের মুক্তি, কে গাইবে শ্রমিকদের জন্য এই স্তবগান-

"হাঁতুড়ি শাবল গাইতি চালিয়ে ভাঙ্গিল যারা পাহাড়,
পাহাড়-কাটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাদের হাড়,
তোমারে সেবিতে হইল যারা মজুর, মুটে ও কুলি,
তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাদেরই গান,
তাদেরি ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান।"?

প্রহসন নয়, শ্রমিকের প্রকৃত মুক্তির সে দিনের অপেক্ষায় আছি।

জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব

মাঈন উদ্দিন

মানুষ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভরশীল। তাই তাকে চলতে হয় সমাজবদ্ধভাবে। একটি সমাজের সব মানুষ এক রকম নয়, তাদের শারীরিক যোগ্যতা, মেধা, দক্ষতার ক্ষেত্র, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি, মন-মানসিকতায় প্রচুর বিভিন্নতা রয়েছে। এটি মহান আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। এটা যদি না থাকত তাহলে, ভালো এবং মন্দের কোনো পার্থক্য থাকত না, ন্যায় অন্যায়ের কোনো পার্থক্য থাকত না, সর্বোপরি সমাজে কোনো ভারসাম্য থাকত না। আল্লাহ বলেন, দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন-যাপনের উপায়-উপকরণ আমি বণ্টন করেছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের ওপর অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পারে (সুরা যুখরুফ ৩২)। সুতরাং আল্লাহর অভিপ্রায় এমন এক সমাজব্যবস্থায় মানুষ বাস করুক যা গড়ে উঠবে পারস্পরিক আন্তরিক সেবা-বিনিময়ের উপর ভিত্তি করে।

এই সেবা দেয়া বা নেয়া প্রধানত দুই ভাবে হতে পারে। একটা হলো স্বেচ্ছায় বা স্বপ্রণোদিতভাবে, আরেকটি হলো অনিচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে। সেবা প্রদানের পেছনে বস্তুগত যে কারণ থাকে তা হলো কর্মসংস্থান, অন্ন-বস্ত্র-আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকা। দরিদ্র মানুষগুলো অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের আনুগত্যে সমর্পিত হয় মূলত এ কারণেই, কিন্তু যখন এই আনুগত্য ও কাজ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মার সংযোগ ঘটে, তখন এই সাহায্য সহযোগিতাগুলোই কর্তব্যবোধ, মানবতাবোধ, ভালোবাসা থেকে উৎসারিত হয়ে ইবাদতে পর্যবসিত হয়। অনাদিকাল থেকে মানুষ প্রধানত দু'টি কারণে অন্যের সেবা করে আসছে - প্রথমত তার প্রয়োজনে এবং দ্বিতীয়টি স্রষ্টার সন্তুষ্টির আশায় এবং দায়িত্ববোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ, কর্তব্যবোধ অর্থাৎ আত্মার তাগিদ থেকে। প্রথম প্রকারের সেবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে

সভ্যতার গর্ব যে অবকাঠামো, দালান কোঠা, চোখ জুড়ানো নান্দনিক স্থাপত্য, সেতু- সেসব যার শ্রম দিয়ে গড়া সেই শ্রমিকের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও। শ্রমিকরা আজও তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও অধিকার ফিরে পায় নি। সভ্যতা যতই এগিয়ে যাক, যতই বাড়ুক হাইটেক প্রযুক্তি, উঁচু উঁচু দালান কোঠা, বাড়ে নি মানবতা। মানসিকতার দিক দিয়ে আজও কথিত সভ্য মানুষরা প্রাচীন দাস যুগেই রয়ে গেছে। পুঁজিবাদী প্রতারণার অর্থব্যবস্থা শ্রমিককে পরিণত করেছে আধুনিক দাসে।

না। আর দ্বিতীয় প্রকারের সেবা সে করে এসেছে দায়বদ্ধতা ও কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে। যেমন সন্তানকে বাবা-মায়ের তিলে তিলে বড় করে তোলা এবং বার্ধক্যে উপনীত বাবা-মাকে সন্তানদের সেবা। মানুষ কেবল যে তার বাবা-মায়ের কাছেই ঋণী তা নয়, সে তার জীবনে বহু বিষয়ের জন্য বহুজনের কাছে ঋণের জালে আবদ্ধ থাকে। যেমন শিক্ষাগুরু, যার কাছে মানুষ আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক শিক্ষা নিয়ে থাকে তাকে সেবা করা মানবসমাজের একটি চিরন্তন বিষয় ছিল যা এখন প্রায় বিলীয়মান। আত্মিক দায়বদ্ধতা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা থেকে মানুষ মানুষকে এমন সেবা করেছে যা মহত্ত্ব ও উচ্চতায় কখনও কখনও আকাশকেও ছাড়িয়ে গেছে।

জাগতিক প্রয়োজন ও আত্মিক প্রেরণা - এ দু'টির ভারসাম্য বজায় রেখে মানবসমাজে সেবার আদান-প্রদানই ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার শিক্ষা। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে আল্লাহর দেওয়া শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে এই ভারসাম্যকে নষ্ট করেছে। ইবলিসের প্ররোচনায় সমাজের একটি শ্রেণি রাজশক্তি, ক্ষমতা, পেশীশক্তি, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক হয়ে; দরিদ্র, কমজোর মানুষকে জোর করে বাধ্য করতে আরম্ভ করেছে তাদের সেবা করার জন্য। জোর করে কাজ করানোর প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হলো ঠিক তখনই ভারসাম্য হারিয়ে গেল, সেবক হয়ে গেল দাস বা গোলাম (Slave), আর সেবা (Service) হয়ে গেল দাসত্ব (Slavery)। এই চরম ভারসাম্যহীনতা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে ঐ দাসদেরকে আর মানুষ বলেই মনে করা হতো না। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো রকম মূল্যই ছিল না, তাদেরকে পণ্যের মত হাটে-বাজারে কেনা বেচা করা হতো, তাদেরকে দিয়ে কাজ আদায়ের জন্য নির্মমভাবে নির্যাতন করা হতো এমনকি তাদেরকে হত্যা করাও কোনো অপরাধ হিসাবে গণ্য হতো না।

আরবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের নবযুগ সূচনা:

দাস হিসেবে মানুষ বেচা-কেনা মানবসমাজের একটি প্রাচীনতম ব্যবসা। আল্লাহর শেষ রসুল যখন আবির্ভূত হলেন তখনও আরবের একটি বড় ব্যবসা ছিল দাস ব্যবসা। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে কৃষ্ণাঙ্গ এবং যুদ্ধবন্দীদেরকে জাহাজ ভর্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিয়ে বিক্রি করা হতো। এই দাসদের দুঃখ-দুর্দশা যে কী অবর্ণনীয় তা বর্ণনা করে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে। বস্তুত যে সমাজে সেবাকে দাসত্বে রূপান্তরিত করা হয় সেই সমাজ একটা জাহান্নাম, আর যে সমাজে মানুষ মানুষকে ভালোবেসে সেবা করে যায়, অন্যকে সাহায্য করে, দান করে, খাইয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামের সমাজ।

প্রমাণ: আম্মা খাদিজা (রা.) জাহেলি যুগে আরবের বাজার থেকে যায়েদ ইবনে হারিসাকে ক্রয় করেছিলেন। হুজুর পাক (দ.) এর সাথে বিয়ের পর তিনি যায়েদকে (রা.) স্বামীর সেবায় নিয়োগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রসুলাল্লাহ (দ.) যায়েদকে আযাদ করে দিলেন। কিন্তু যায়েদ (রা.) রসুলাল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। যায়েদের (রা.) চাচা-বাবারা তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে মহানবীর (দ.) কাছে আসলেন। মহানবী (দ.) বললেন, 'সে তো এখন মুক্ত, আপনারা তাকে নিয়ে যেতে পারেন।' কিন্তু যায়েদ (রা.) ফিরতে রাজি হলেন না। কারণ তিনি মহানবীর (দ.) আচরণে ও ব্যবহারে এতটাই

মুগ্ধ ছিলেন যে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহানবীর (সা.) সাথে ছায়ার মতো অনুবর্তী ছিলেন।

আনাস (রা.) যখন বালক ছিলেন তখন তাঁর মা ছেলেকে এই বলে রসুলাল্লাহর (দ.) কাছে তুলে দিলেন যে, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! ও আপনার কাছে থাকবে এবং আপনার সেবা করবে।' এমন কথা কি কেউ কোনোদিন শুনেছে যে, একজন মা তার সন্তানকে এনে কারও দাসত্বে নিযুক্ত করেছে? ইতিহাস কখনো বলে না যে আনাস (রা.) রসুলাল্লাহর (দ.) দাস ছিলেন, বলা হয় খাদেম অর্থাৎ সেবক। আনাস (রা.) জীবনের একটা পর্যায়ে এসে ধনে, জনে, জ্ঞানে এতো সমৃদ্ধ হলেন মানুষ দূর দূরান্ত থেকে তাঁর কাছ থেকে রসুলাল্লাহর (দ.) জীবন সম্পর্কে, ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত। তিনি রসুলাল্লাহর (দ.) জুতাগুলো পর্যন্ত পরম শ্রদ্ধায় পরিষ্কার করে দিতেন যা ছিল প্রকৃত সেবা, দাসত্ব নয়। এরপরে আছে ওমর (রা.) এর উদাহরণ। মদিনা থেকে যেরুজালেম প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার মরুপথে ওমরের (রা.) সঙ্গী ছিলেন একজন ব্যক্তি যাকে ইতিহাসে দাস বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এ কেমন দাস যাকে মনিব উটের পিঠে উঠিয়ে উটের রশি ধরে উত্তপ্ত মরুর বালুকারাশির উপর দিয়ে পথ চলেন? আল্লাহর রসুল বলেছিলেন, 'তোমাদের অধীনস্থরা তোমাদের ভাই'। তাই দাস শব্দটি ইসলামের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। ইসলামে দাস- দাসীর কোনো ব্যবস্থা নেই। ইসলামের আইন হলো, জোরপূর্বক কাউকে কোনো কাজে বাধ্য করা যাবে না, বাধ্য করলে সে দণ্ডিত হবে। আল্লাহ্ হচ্ছেন মালিকুল মুলক, রাজ্য-সাম্রাজ্যের মালিক, মালিকিন্নাস (মানুষের প্রভু), মা'বুদ (যার দাসত্ব করতে হয়), একমাত্র রাব্বুল আলামীন (সৃষ্টি জাহানের একচ্ছত্র প্রভু)। সুতরাং কোনো মানুষ প্রকৃত অর্থে যেমন কখনও কারও প্রভু বা মালিক (Master, Lord) হতে পারে না, তেমনি কেউ কারও দাস বা গোলামও (ঝষধাব, ঝবৎাধহঃ) হতে পারে না। কেবল সেবক, অনুচর, সাহায্যকারী, কর্মচারী (Attendant, Helper, Employee) হতে পারে। এবং সেই সেবক বা অনুচরদের সম্পর্কেই রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরো তাদেরকে তাই পরাবে, অসুস্থ হলে তাদেরকে সেবা করবে।' হুজুরের এই কথাগুলো নিছক উপদেশ ছিল না, এগুলো ছিল উম্মাহর প্রতি তাঁর হুকুম। এবং সকল আসহাবগণ রসুলের এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন। রসুলাল্লাহর শিক্ষাপ্রাপ্ত উম্মতে মোহাম্মদীর কেউ কোনো সেবককে নির্যাতন করেছেন এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। কোনো সেবক তার মালিকের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে শাসকের কাছে নালিশ জানালে ন্যায়বিচার পেত। ইসলামে সেবকদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও ছিল অবারিত।

অপরদিকে পৃথিবীতে যখনই বৈষয়িক উদ্দেশ্য ও মানবিকতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তখনই মানুষ নিজেকে মালিক, প্রভু আর অধীনস্থদের দাস মনে করেছে। যখন মানুষ ভেবেছে যে, আমি সকল জবাবদিহিতার উর্ধ্বে, বিধানের উর্ধ্বে, তখন সে চরম স্পর্ধায় নিজেই প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই সে তার অধীনস্থদের গলায় শিকল লাগিয়ে, চামড়া পুড়িয়ে মার্কা দিয়ে, কথায় কথায় চাবুক পেটা করে, নাক কেটে, বস্ত্রহীন রেখে, দিনের পর দিন অনাহারে রেখে, পশুর খোয়াড়ে বাস করতে বাধ্য করেছে।

> *জাগতিক প্রয়োজন ও আত্মিক প্রেরণা - এ দু'টির ভারসাম্য বজায় রেখে মানবসমাজে সেবার আদান-প্রদানই ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার শিক্ষা। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে আল্লাহর দেওয়া শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে এই ভারসাম্যকে নষ্ট করেছে। ইবলিসের প্ররোচনায় সমাজের একটি শ্রেণি রাজশক্তি, ক্ষমতা, পেশীশক্তি, অর্থ-বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক হয়ে; দরিদ্র, কমজোর মানুষকে জোর করে বাধ্য করতে আরম্ভ করেছে তাদের সেবা করার জন্য। জোর করে কাজ করানোর প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হলো ঠিক তখনই ভারসাম্য হারিয়ে গেল, সেবক হয়ে গেল দাস বা গোলাম, আর সেবা হয়ে গেল দাসত্ব এই চরম ভারসাম্যহীনতা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে ঐ দাসদেরকে আর মানুষ বলেই মনে করা হতো না।*

রসুলাল্লাহ কর্তৃক দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা:

মক্কা বিজয়ের পর ক্বাবা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রসুলাল্লাহ দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। ঘোষণাটি নিম্নরূপ- হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে হেদায়াত (পথ নির্দেশ) করছি যে, সেবকদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। তাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমরা কি অবগত নও যে, তাদের কাছেও এমন এক হৃদয় রয়েছে যা কষ্ট পেলে ব্যথিত হয় এবং আরামে খুশী হয়? তোমাদের কী হলো যে, তোমরা তাদের হৃদয়ের সন্তুষ্টি বিধান করো না? আমি লক্ষ্য করছি, তোমরা

তাদেরকে হীন মনে করো এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো না। এটা কী? এটা কি জাহেলিয়াতের অহঙ্কার নয়? নিঃসন্দেহে এটা যুলুম ও অবিচার।

আমি জানি, জাহেলিয়াতের যুগে তাদের কোনো মর্যাদা ছিল না। পশুর চেয়েও তাদেরকে অধম মনে করা হতো। সর্বত্র আমীর ও গোত্র-সর্দাররা সম্মান ও কর্তৃত্বের মালিক সেজে বসেছিল। আল্লাহর বান্দারা এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ হিসাবে সবাই সমান এবং তোমাদের খেদমত-কারীরাও ইনসাফের অধিকারী। সেটা ছিল এমন এক যুগ, যখন আমীর ওমরাহ এবং শাসকবর্গ তাদেরকে মানবীয় স্তরের উর্ধ্বে মনে করত। নিজেদেরকে নিষ্পাপ ঘোষণা করত। তাদের দৃষ্টিতে খাদেমদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মনিবদের খেদমত করা এবং তাদের যুলুম সহ্য করা। মনিবদের সাথে কাজের লোকদের বসা নিষিদ্ধ ছিল। তাদের সামনে খাদেমদের কথা বলা পাপ ছিল। মনিবদের কোনো কাজের সামান্যতম বিরুদ্ধাচারণ হত্যাযোগ্য অপরাধ ছিল। ইসলাম এ ধরনের রসম-রেওয়াজের অবসান ঘটিয়েছে এবং জাহেলি অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে অবহিত করছি যে, তোমাদের রবের ফরমান হচ্ছে:

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।' (সুরা হুজরাত ১৩)

তোমরা জানো যে, সকল মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরি। তাহলে অহঙ্কারের হেতু কী? মনে রাখবে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার উর্ধ্বে কোনো মর্যাদা নেই এবং মনিব-কাজের লোক, উচ্চ-নীচু, ধনী-গরিব সবাই সমান। ইসলামের দৃষ্টিতে যে জিনিস বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে তা হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সতর্কতা) ও আমলে সালেহ (দীন প্রতিষ্ঠার কাজ)। এটাই যখন বাস্তব তখন কেন তোমরা তোমাদের কাজের লোকদেরকে নীচ মনে করো? আমি লক্ষ্য করেছি যে, মনিবের সাথে কোনো গোলাম কথা বলতে চাইলে রাগে মনিবের চেহারা হিংস্র প্রাণীর মতো রক্তলোলুপ হয়ে যায় এবং সে কোনোভাবেই তার ক্রোধ দমন করতে পারে না। এটা জাহেলিয়াত ছাড়া আর কী হতে পারে? এমন হতে পারে, কাজের লোক তার মনিবের চেয়ে উত্তম এবং তার আমলও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

হে মানুষ! যখন হুকুমত ছিল জাহেলিয়াতের এবং নফসের পূজা তার চূড়ান্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল মানুষের উপর, তখন যে কি মর্মান্তিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা মানবতার দৃষ্টি কখনও ভুলতে পারে না। আমি সে যুগও দেখেছি, যখন দাসদের সাথে বর্বর আচরণ ও জুলুম করা হতো। মহাপবিত্র আল্লাহ তাদের উপর রহম করেছেন, তাদের অধিকার প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার হেদায়াত করেছেন। আমি আমার রবের ফরমান মোতাবেক বলছি যে, তোমরা তাদেরকে নিজেদের ভাই মনে করো। তাদের কাছ থেকে এতটুকু কাজ আদায় করো যতটুকু তারা সহজে করতে পারে। তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খেতে দাও। তোমরা যা পরো তাই তাদেরকে পরতে দাও। তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করো যেরূপ তোমরা আপনজনের সাথে করে থাকো, তাদের জন্য তা পছন্দ করো যা তোমরা নিজেদের জন্য করো। তাদেরকে নীচ ও তুচ্ছ মনে করো না। তোমরা যখন সফরে যাও আর তারাও তোমাদের সঙ্গে থাকে, তখন তাদের আরামের প্রতিও খেয়াল রেখ। তোমাদের সাথে সওয়ারী থাকলে কিছুক্ষণ তোমরা আরোহণ করো এবং কিছুক্ষণ তাদেরকেও আরোহণের অনুমতি দিও। মানুষ হিসেবে তারা কোনো অংশেই তোমাদের চেয়ে ছোট নয়। যেরূপ হৃদয় তোমাদের রয়েছে; সেরূপ তাদেরও রয়েছে। তোমরা কি লক্ষ্য করো নি যে, আমি যায়েদকে আযাদ করে আমার ফুফাতো বোনের সাথে তার বিয়ে দিয়েছি এবং বেলালকে মু'আযযিন নিযুক্ত করেছি এজন্য যে তারা আমার ভাই। তোমরা দেখেছ যে আনাস আমার কাছে থাকে, তাকে আমি ছোট মনে করি না। কোনো কাজ না করলেও আমি তাকে বলি না যে কেন তুমি তা করো নি। ঘটনাক্রমে তার দ্বারা কোনো ক্ষতি হয়ে গেলেও আমি তাকে কোনো ভর্ৎসনা করি না। আমি তোমাদেরকে নসিহত করছি যে, তোমাদের কোনো খাদেম যখন খাবার নিয়ে আসে তখন তাকেও তোমাদের সাথে বসানো উচিত। তারা যদি একসঙ্গে বসতে পছন্দ না করে, তাহলে তাদেরকে কিছু খাবার দিয়ে দেয়া উচিত। তোমাদের কোনো সেবক অপরাধ করে থাকলে সত্তরবার তাকে মাফ করবে–এ জন্য যে, তুমি যাঁর গোলাম, তিনি তোমার অপরাধ হাজার বার মাফ করে দেন। মনে রেখ, কোনো লোক তার গোলামের প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ করলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। আমি পুনরায় তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের সেবক তোমাদের ভাই। তারা বাধ্য হয়ে তোমাদের অধীন হয়েছে। তাই যার ভাই তার নিজের অধীন, তার উচিত- সে নিজে যা খায় তা-ই তাকে খেতে দেয়া, নিজে যা পরে তা-ই তাকে পরতে দেয়া এবং সাধ্যের বাইরে তার কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় না করা। সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতাল্লাহ।

প্রাকৃতিক সূত্র

সমাজের ধ্বংস, প্রচলিত ব্যবস্থার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী!

রাকীব আল হাসান

শূন্যে নিক্ষিপ্ত কোনো বস্তু যত উর্ধ্বে ওঠে তার পতনের ক্ষণ ততই নিকটে আসে। বস্তুটি যখন সর্বোচ্চ উচ্চতায় ওঠে তখন তার পতন নিশ্চিত হয়। এই প্রাকৃতিক নিয়ম সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মুক্তভাবে পড়ন্ত একটি বলের পতনের শেষ সীমা তো ভূমিই হয়। ভূমিতে পতিত হবার পর তাকে আবার উর্ধ্বে উঠতেই হয়। কেউ তার সীমা অতিক্রম করতে পারে না, শুধু অতিক্রমের প্রয়াস করতে পারে। কোনো রাজার ঔদ্ধত্য যখন চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায় তখন তার ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। যখন কোনো সমাজ অন্যায়, অবিচারে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, সমাজের বলশালী মানুষগুলো অন্যায়ের সীমা অতিক্রমের প্রয়াস করে তখন সে সমাজের ধ্বংসও অনিবার্যই হয়ে ওঠে। ইতিহাস স্বাক্ষী, যতবার এই ভূমি অধর্ম দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছে ততবারই মহাবিধ্বংস ঘটেছে আর ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। সামাজিক অন্যায়ের অনেকগুলো দিক থাকে, সমস্ত দিক দিয়েই যেন পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে আজ। এখানে শুধু একটি দিক নিয়ে আলোচনা করব, তা হলো নারীদের প্রতি হওয়া অন্যায়।

সৃষ্টিকে দেখুন। নতুন বৃক্ষকে জন্মদানকারী বীজের আশ-পাশে সৃষ্টিকর্তা ফুলের পাপড়ি নির্মাণ করেছেন। তাকে রং ও সুগন্ধ দিয়ে ভরে দিয়েছেন। যেখানে ভবিষ্যতের জন্ম হয় সেখানে তো কেবল সৌন্দর্য, কেবল সুখ, সন্তোষ ও সম্মান হওয়া আবশ্যক। অথচ আজ মানবসমাজ ভবিষ্যতের জন্ম দায়িনী স্ত্রী লোককে দুঃখ দিয়ে সমগ্র ভবিষ্যতকে দুঃখ দ্বারা পূর্ণ করে ফেলেছে। মানবসমাজ যখনই অন্যায়, অবিচারে পরিপূর্ণ হয়েছে তখনই স্ত্রীলোককে শোষণ, অন্যায় আর অপমান দিয়েছে। নিজের আশে-পাশে দেখুন, সমগ্র ইতিহাসকে দেখুন, এই একইরূপ দেখা যায় যে, পুরুষের ঈর্ষা, অহংকার, বৈরিতা, লালসা এই সমস্ত কু চিন্তার পরিণাম স্ত্রীলোক ভোগ করে। যুদ্ধ পুরুষ করে আর পরাজিত নগরীর স্ত্রীলোকের বলাৎকার করা হয়। পুরুষ নিজের সম্পত্তি হারায়, আর স্ত্রী লোকের ভাগ্যে নেমে আসে ক্ষুধা। পুরুষ জীবনে পরাজিত হয়ে পরিবারকে ত্যাগ করে আর স্ত্রী নিজের সন্তানদের ক্ষুধা নিবারণের তাড়নে সংঘর্ষ করতে থাকে। সমগ্র সংসারের দুঃখের হিসেব করুন, স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রী লোক অধিকতর দুঃখ ভোগ করে। এ কোন প্রকারের সমাজ নির্মাণ করেছি আমরা! যেখানে মনুষ্য জাতির অর্ধেক ভাগ বাকি অর্ধেক ভাগকে নিরন্তর পদদলিত করছে। আর বর্তমানে তো স্ত্রীলোকের প্রতি অসম্মানের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রমের প্রয়াস করা হচ্ছে, যা মনুষ্যসমাজের ধ্বংসের বার্তাই বহন করে। দুঃখের সাথে স্মরণ করাচ্ছি এবারের পয়লা বৈশাখে প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার মানুষের সামনে নারী নিগ্রহ/বস্ত্রহরণের ঘটনা। এমন সমাজের নির্মাণ তো আমরাই করেছি। উৎসবের নামে হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতেই প্রশাসনের তোয়াক্কা না করে যে সমাজে নারীর বস্ত্রহরণ করা হয় সে সমাজের ধ্বংস অতি অবশ্যই সন্নিকটে। ইতিহাসের একটা শিক্ষা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না- কিছু কিছু ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও মহাভারতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পয়লা বৈশাখের এই ঘটনা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে একই রকম। প্রকাশ্যে নারীর শ্লীলতাহানি তো নারীর প্রতি অসম্মানের চূড়ান্ত সীমা, বর্তমানে এই সীমাও অতিক্রমের প্রয়াস করা হচ্ছে। সুতরাং এই সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাটি ঘটেছিল একেবারে রাজ দরবারে। সেই দরবারে উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং কুরু সম্রাট ধৃতরাষ্ট্র, বিদ্যার আধার মহামন্ত্রী বিদুর, শক্তির বিচারে অপরাজেয় মহামহিম ভীষ্ম, অস্ত্র বিদ্যায় অতুলনীয় গুরু দ্রোণ, আজীবন সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত সম্রাট যুধিষ্ঠিরসহ অন্যান্য পাণ্ডবগণ। তাদের চোখের সামনেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের প্রয়াস হয়েছিল। যার কারণে তাদের মধ্যে অনেককেই জীবন দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল।

ঢাবি এলাকায় যে ঘটনাটি ঘটেছে তা প্রকাশ্য দিবালোকে, গিজগিজ করা হাজার হাজার লোকের সামনে, সিসিটিভি-আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী টিমের কয়েক গজের মধ্যে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ঘটনাটি ঘটেছে এমন স্থানে যা এদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বলে স্বীকৃত। এত ভয়াবহ ঘটনা হওয়া সত্ত্বেও এটা নিয়ে কোথাও তেমন উচ্চ-বাচ্য হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা

নিরুদ্বেগ প্রক্টর ঘটনার কয়েক ঘণ্টা পরেও কম্পিউটারে দাবা খেলায় মেতেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনার সাথে জড়িত কয়েকজনকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হলেও পরে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও এই দেশে তদন্ত কমিটির সফলতা নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন রয়েছে।

প্রকাশ্য রাজসভায় দুর্জধনাদি মহারানী দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের প্রয়াস করেছিল, যার ফলস্বরূপ মহাবিধ্বংসী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। সেই সভায় যারা মৌন থেকে এমন অধর্ম হতে দিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের দণ্ডপ্রাপ্তি হয়েছিল। আর্যাবর্তের সকল অধর্মী ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হয়েছিল। আজ আমাদের সমাজের এই অধর্ম দেখে যারা মৌন থাকবে, যারা প্রতিবাদ করবে না তাদেরও দণ্ডপ্রাপ্তি অবশ্যই হবে। অনেকেই এর দায় চাপাচ্ছেন প্রশাসনের প্রতি, সরকারের প্রতি আর ছাত্রলীগের প্রতি। অবশ্যই সরকার ও প্রশাসন এর দায় এড়িয়ে যেতে পারে না তবে সেই সাথে সেখানে উপস্থিত প্রতিটি মৌন ব্যক্তিই এর জন্য দায়ী। গুরু দ্রোণ, ভীষ্মের ন্যায় মৌনতার খেসারত সরকার, প্রশাসনসহ সেখানে উপস্থিত সকল মৌন ব্যক্তিকে প্রাকৃতিকভাবেই পেতে হবে।

তবে আশার কথা হলো বিধ্বংসই নবনির্মাণের কারণ। আর বিধ্বংসের কারণ হলো অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রমের প্রয়াস। তাই আমি বিশ্বাস করি ঘুণে ধরা, পচে যাওয়া এই সমাজের ধ্বংস, প্রচলিত সিস্টেমের পরিসমাপ্তি খুব শীঘ্রই ঘটবে। সমাজে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হবে আর সত্যের ধ্বজা আন্দোলিত হবে।

স্পষ্ট দেখতে পাবেন যে পুরুষের তুলনায় স্ত্রী লোক

প্রকৃত সাম্যবাদীরা আসুন পথ পাওয়া গেছে

মসীহ উর রহমান

প্রচলিত রাজনীতিক আদর্শের মধ্যে দুটো প্রভাবশালী ধারা রয়েছে- ডান ও বাম। মাঝামাঝি আরেকটি ধারাও আছে যারা সুবিধামত যে কোনো দিকে ঝুঁকে পড়ে। ডান বলতে বোঝানো হয় যাদের রাজনীতি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, আর বাম বলতে বোঝায় যাদের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত। এদের কোনো ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নেই। ডান ও বাম শব্দ দুটির মধ্যে ভালো ও মন্দের ধারণাও প্রকাশ পায়। ডান মানে ভালো আর বাম মানে খারাপ। যেমন বাম হাতের উপার্জন মানে অবৈধ উপার্জন। যারা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় রাজনীতি করেন তাদের কপালে এই 'বাম' খেতাবটি কীভাবে জুড়ে গেল সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই। অবশ্য এ নিয়ে তাদের কোনো খেদ নেই, তারা ধর্মের প্রভাবমুক্ত হিসাবে নিজেদেরকে মানবতাবাদী, প্রগতিবাদী, মুক্তমনা বলে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন।

সে যা-ই হোক, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের যারা অনুসারী তাদের জন্য কি ধর্মহীন, নাস্তিক হওয়া অবধারিত বিষয়?

অনেকে বাম আদর্শে বিশ্বাসী বলতেই নাস্তিক বলে মনে করেন। বাম ও নাস্তিক এ শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে অন্য কথা। আমরা দেখেছি, বাম আদর্শের অনুসারীরা মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অন্ধত্ব থেকে নিজেদের মননকে মুক্ত করতে সচেষ্ট। বর্তমানে পৃথিবীতে বিরাজিত সবগুলো ধর্মই যখন বিকৃত হয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের পণ্যে পরিণত হয়েছে, সেগুলো সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থীদের দ্বারা এবং তথাকথিত ডানপন্থীদের দ্বারা ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে মানুষের সমাজকে পশুর সমাজে পরিণত করছে, সেই বিকৃত ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই প্রতিটি বোধসম্পন্ন মানুষের অবশ্য কর্তব্য। সে দিক থেকে ডানপন্থী রাজনীতির দাবিদারদের থেকে মানুষ হিসাবে বামপন্থীরা এগিয়ে আছেন। এই বিকৃত ধর্মবিশ্বাস আমাদের এই জাতিটিকে অন্য জাতির দাস বানিয়ে রেখেছে। এ চরম সত্যটি উপলব্ধি করেই মাননীয় এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যাতে করে এই বিকৃত ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা দূষিত পরিবেশকে নির্মল, অনাবিল ধর্মের শাশ্বত শিক্ষার দ্বারা প্রতিস্থাপন করতে পারেন।

ধর্ম এবং ধর্মীয় কুসংস্কার- এ দুটি পৃথক বিষয়। ধর্মগুলো পাঠিয়েছেন মহান আল্লাহ। তিনি যে রূপে সেগুলো পাঠিয়েছেন সেই রূপটি মানুষ যদি বিকৃত করে ফেলে সেটার জন্য আমরা কাকে দোষারোপ করবো, আল্লাহকে না মানুষকে। একটি স্রোতস্বতী নদী যে কোনো জনপদের জন্য আশীর্বাদ। কিন্তু সেই নদীর পানিতে নাগরিক বর্জ্য, কারখানার বিষাক্ত পানি ইত্যাদি অনবরত ফেলতে ফেলতে যদি সেই নদীর পানি দূষিত করে ফেলা হয় তাহলে সেজন্য কে

দায়ী? নিশ্চয়ই নদী দায়ী নয়, দায়ী মানুষ। নদীর সেই পানি আপনি ব্যবহার করতে পারছেন না, ব্যবহার করলে আপনি হয়তো বাঁচবেনই না, কিন্তু সেজন্য কি আপনি বলবেন যে নদী বলতে কোনো কিছু নেই? আজ বিকৃত ধর্মগুলো মানুষের অকল্যাণ করছে তার জন্য স্রষ্টাকে যারা দায়ী করেন তারা ভুল করেন। আর যারা মনে করেন স্রষ্টাই নেই, ধর্মগুলো মানুষের বানানো, তারা নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী ভাবতে পারেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তিহীন। আমরা সেদিকে যাব না, কারণ নাস্তিককে আস্তিক বানানোর জন্য অনেক বই লেখা হয়েছে। আমাদের কাজ ওটা নয়। আমরা মনে করি, যারা নাস্তিক তারাও মানুষ, সুতরাং মানুষ হিসাবে যে অধিকার একজন আস্তিক পেতে পারে, একজন নাস্তিকও তাই পাবে। এবং সেইসঙ্গে আমরা এও মনে করি যে, একজন খাঁটি সমাজতান্ত্রিক হতে নাস্তিক হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, ধর্মের শাশ্বত সত্যগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তথাপি সমাজতান্ত্রিকরা ধর্মের বিকৃতিকে জাতীয় জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ না দিতে গিয়ে কার্যত নাস্তিকে পর্যবসিত হয়েছেন, নাস্তিকতাকে ফ্যাশন বা স্টাইলে পরিণত করেছেন। তবে সকল সমাজতান্ত্রিকই যে নাস্তিক এটি একটি ভুল ধারণা।

যা-ই হোক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা মানবতার কল্যাণে ব্যক্তিজীবনে যে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং যে দুঃসাহসী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন, এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, তারা সর্বযুগে পূজনীয় থাকবেন। কিন্তু বাস্তবে সেটা হয় নি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ মানুষকে কার্যত শান্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক নেতারা বিশ্বজুড়ে যে 'যৌথখামার', 'ওয়ার্কার্স প্যারাডাইস' সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন সেটা গণমানুষের জন্য নরককুণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে সর্বস্ব ত্যাগকারী সেই বিপ্লবীদের ভাস্কর্যগুলোর উপর তাদের নিজ দেশের মানুষ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। সমাজতন্ত্রের চেতনা তাদের কাছে ফাঁকাবুলি বলে প্রমাণিত হয়েছে। তাই এককালের বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আজ ঘোর পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শান্তি মেলে নি। ফুটন্ত কড়াই থেকে তারা লাফ দিয়ে চুলায় পড়েছে মাত্র।

মানবতার কল্যাণে যারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে বিপ্লবের অগ্নিময় পথকে সঙ্গী করে জীবন কাটিয়ে গেছেন, আমরা হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই, যদিও তারা অনেকেই হয়তো নাস্তিক ছিলেন। সেটা কোনো মুখ্য বিষয় নয়। তাদের ব্যর্থতার কারণ তারা শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের জন্য যে পথটি অবলম্বন করেছিলেন, সেই পথটি দুর্ভাগ্যক্রমে ভুল ছিল। আপনি যদি একদল মানুষকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পথ ভুল করে সাহারা মরুভূমিতে নিয়ে ফেলে দেন, তারা কি আপনাকে সম্মান করবে? পথ ভুলের তাই কোনো ক্ষমা নেই।

আমরা হেযবুত তওহীদও মানবতার কল্যাণে নিজেদের সকল সম্পদ, জীবন, পরিবার, পুত্র-পরিজন ত্যাগ করেছি। একটি আদর্শকে বুকে ধারণ করে পরার্থে জীবন-সম্পদ উজাড় করে দেওয়ার যে সীমাহীন আনন্দ সেটা আমরা বুঝি। সমাজতান্ত্রিকদের মধ্যে যারা প্রকৃতই মানুষের চোখের জল মোছাতে আন্দোলন করেন, তাদের উদ্দেশে আমাদের এই লেখা। যারা মুখে শ্রেণিহীন সমাজের কথা বলেন আর নিজেরাই পুঁজিপতি পেটমোটা বুর্জোয়া হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন, আমাদের দৃষ্টিতে তারা বিশ্বাসঘাতক, তারা উদ্বাস্তু তাদের আদর্শের ভূমি থেকে। মাও সেতুং-এর চীন এখন বিশ্বের অন্যতম প্রধান পুঁজিবাদী দেশ। আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেক বাম আদর্শবাদীকে জানি যারা গণসঙ্গীত করেন,

হেই সামালো, আসছে সুদিন/জোট বাঁধো ভাই, তৈরি সবাই/হবে বিপ্লব, হাতে ধরো সঙ্গীণ...।

গান গেয়ে, নাটক করে, পোস্টার মেরে, মিছিলে শ্লোগান দিয়ে, পার্টি অফিসে বসে তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশাল আন্দোলনের গল্প করে আর বিপ্লবের দিন গুনে গুনে তারা বুড়ো হয়ে গেছেন। কোনো প্রলোভনের কাছে সততা বিকিয়ে দেন নি, ছেড়া চটি, তালিমারা পাঞ্জাবি পরে থেকেছেন, অনেকে সংসার পর্যন্ত করেন নি। তাদেরকে যে যা-ই বলুক, আমরা তাদেরকে ধর্মহীন মনে করি না। কারণ মানুষের পরম ধর্ম 'মানবতা' তাদের মধ্যে পুরোমাত্রায়ই আছে। কিন্তু তাদের নেতাদের অনেকেই ধর্মব্যবসায়ীদের মত লালবই আর দ্যাস ক্যাপিটালের ব্যবসা করে টাকার কুমিরে পরিণত হয়েছেন। কমরেডদের করুণ পরিণতির একটাই কারণ- সঠিক পথ না পাওয়া।

আমাদের জীবন ধন্য যে, আমরা একটি সঠিক পথ পেয়েছি, যে পথে শান্তি সুনিশ্চিত, যেটা পরীক্ষিত, ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। এমামুয্যামান একটি উচ্চ অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও সারাটি জীবন কাটিয়েছেন সাধারণ মানুষের মাঝখানে, যিনি সকল সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষের মুক্তির সংগ্রামের তরে, আমরা সেই মহাপ্রাণ এমামুয্যামানের প্রেরণায় উজ্জীবিত। আমরা বলছি, পথ পাওয়া গেছে। ডান-বাম যা-ই হোন না কেন, মানুষের অশ্রুতে যার হৃদয় সিক্ত হয়, ঘুণে ধরা সমাজটিকে যারা পুনর্নির্মাণ করতে চান, সর্বপ্রকার অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের প্রতিবাদে যার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সেই মানবধর্মের অনুসারীদের প্রতি আমাদের আহ্বান- আসুন, পথ পাওয়া গেছে।

মৌনতাই আলেমদের বর্তমান হীনতার কারণ

শফিকুল আলম উখবাহ

আল্লাহ বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।' (সুরা মুজাদালা, আয়াত: ১১)। কিন্তু এ মর্যাদার বেলায় একজন সাধারণ মো'মেনের তুলনায় একজন জ্ঞানী মো'মেনের অর্থাৎ আলেমের মর্যাদা অনেক বেশি এ কথা আল্লাহর রসুল অনেকবার বলে গেছেন। আল্লাহও বলেছেন, 'যারা জানে (আলেম) এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? (সুরা জুমার: ৯)।

সুতরাং আমরাও সত্যিকার আলেমদের শ্রদ্ধা করি। কিন্তু পেশাদার আলেমগণ অর্থাৎ ধর্মব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহ অপবিত্র ও জাহান্নামী বলে ঘোষণা করেছেন বলে আমরাও তাদেরকে বলি, ধর্মব্যবসা পরিহার করে হালাল উপার্জন করার জন্য এবং তাদের জ্ঞানকে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করার জন্য। কারণ এর মধ্যেই আলেমের প্রকৃত মর্যাদা নিহিত। আল্লাহর রসুল বলেছেন, আলেমের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্র। এর কারণ হচ্ছে, ঐ কলমের কালি মানবতার কল্যাণে আত্মোৎসর্গকারী অসংখ্য শহীদের জন্ম দিতে সক্ষম। কোনো আলেম দাবিদার যদি নিজেই নিজের জীবন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় তথা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে অসম্মত হন, তাহলে তার ঐ জ্ঞানের দ্বারা মানবজাতির কোনো কল্যাণের সম্ভাবনা থাকে না। অমন আলেমকে জ্ঞানী না বলে জ্ঞানপাপী বলা হয়ে থাকে, তাদের এই জ্ঞান তামসিক জ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে ধর্মব্যবসাকে হারাম করা সত্ত্বেও তারা জাহান্নামের আগুনের ব্যাপারে নির্ভীক, আল্লাহর ভাষায়- 'আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল।' (সুরা বাকারা ১৭৪)। অথচ আলেমদের প্রধান বৈশিষ্টই হচ্ছে তারা আল্লাহকে, তথা আল্লাহর শাস্তিকে, জবাবদিহিকে ভয় করবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আলেম তারাই তাঁকে অধিক ভয় করে (ফাতির : ২৮)।

বর্তমানে আমাদের সমাজে আলেম বলতে তাদেরকেই বোঝানো হয় যারা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে দাখেল, ফাজেল, কামেল ইত্যাদি সার্টিফিকেট অর্জন করে মসজিদে মাদ্রাসায় চাকুরি করেন, দীনের মাসলা-মাসায়েলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে জাতির মধ্যে ফেরকা-মাযহাবের বিভক্তি জিইয়ে রাখেন, ফতোয়াবাজির নামে অনধিকারচর্চা করেন, সুন্নতি লেবাসের নামে আরবীয় পোশাক আশাক পরেন, দাড়ি-টুপি ধারণ করেন, ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ করেন ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহর দৃষ্টিতে এরা প্রকৃত আলেম নন, তারা ধর্মব্যবসায়ী। সুতরাং সম্মান করার আগে সত্যিকার আলেমদেরকে চিনতে হবে।

কোনো আলেম দাবিদার যদি নিজেই নিজের জীবন সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় তথা মানুষের কল্যাণে ব্যয় করতে অসম্মত হন, তাহলে তার ঐ জ্ঞানের দ্বারা মানবজাতির কোনো কল্যাণের সম্ভাবনা থাকে না। অমন আলেমকে জ্ঞানী না বলে জ্ঞানপাপী বলা হয়ে থাকে, তাদের এই জ্ঞান তামসিক জ্ঞান ছাড়া কিছুই নয়।

বর্তমানে এক শ্রেণির আলেম দাবিদারদের অহংকারে মাটিতে পা পড়ে না। লেবাস, সুরত ধারণ করে এবং ধর্মগ্রন্থ মুখস্থ করে তারা নিজেদেরকে খুব জ্ঞানী ভাবতে শুরু করেন যা স্পষ্ট অহংকার। হেযবুত তওহীদের এমাম এবং সদস্য সদস্যারা অধিকাংশই মাদ্রাসা শিক্ষিত নন বলে ধর্মব্যবসায়ী আলেমগণ হেযবুত তওহীদের সত্য প্রতিষ্ঠার কাজের বিরোধিতা করেন, অথচ প্রকৃতপক্ষে আমরা যে কাজটি করছি সেই কাজ করার কথা ছিল তাদের। আমরা স্বীকার করি যে, তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, কোর'আনের অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ও তাদের নখদর্পণে, হাদীসশাস্ত্রও মুখস্থ। ফিকাহ-তাফসীর সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েলের জ্ঞানের দিক দিয়েও আমাদের সঙ্গে তাদের তুলনা চলে না। তারা অতি নিষ্ঠাসহকারে নামাজ, রোজা, এবাদত-উপাসনা ইত্যাদি আমল করে থাকেন। কিন্তু আমাদের কথা হলো- এতকিছু সত্ত্বেও তাদের এই এলেম, আমল, এবাদত-উপাসনা অর্থহীন, কারণ মানুষের প্রকৃত এবাদত হচ্ছে মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, সে ব্যাপারে তাদের কোনো অবদান নেই। সমাজে যখন একজন নারীর শ্লীলতাহানি হয়, মানুষ যখন দুস্কৃতকারীদের ভয়ে আতঙ্কে ঘরের

বাইরে বের হয় না, তখন সেই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্য এবাদতে পরিণত হয়। এই এবাদত না করে যতই তাহাজ্জুদ পড়া হোক, ঈদ-কোরবানি, তারাবির নামাজ, রোজা, উপাসনা করা হোক তার কোনোই দাম থাকে না। ব্যক্তিগত এবাদত বন্দেগী করে জান্নাতে যাওয়ার তখন কোনো সুযোগ থাকে না। মনে রাখতে হবে, এলেম বা সত্যের জ্ঞান যখন কেউ প্রাপ্ত হয় সে আল্লাহর তরফ থেকেই প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ এই জ্ঞান কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতিকেই দান করেন। সৃষ্টির সূচনালগ্নে তিনি আদম (আ.) কে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন মানেই জ্ঞান দান করেছিলেন যে জ্ঞান কেয়ামত পর্যন্ত তাঁর সন্তানদের মস্তিষ্কে একটু একটু করে বিকশিত হবে এবং যার দ্বারা মানবজাতি সমসাময়িক সমস্যার উত্তর খুঁজে পেয়ে কল্যাণপ্রাপ্ত হবে। একটি নদীর প্রবাহে যেমন কোনো ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত হতে পারে না, তেমনি জ্ঞানও অনুরূপ প্রাকৃতিক তথা আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদবিশেষ। এরও কোনো ব্যক্তি মালিকানা হতে পারে না। তাই জ্ঞান মানবজাতির আমানত, এই আমানত কুক্ষিগত করে কবরে চলে যাওয়া বিরাট অন্যায় এবং সে আল্লাহর গজবের পাত্র। তাই আলেমদের প্রধান কর্তব্যই হচ্ছে, তার জ্ঞানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। বর্তমানে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কল্যাণের চেয়ে ধ্বংসাত্মক কাজেই বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে, আর ধর্মীয় জ্ঞানকে ব্যবহার করা হচ্ছে দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িকতা, রঙ-বেরঙের ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ, জাতির মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি, রাজনীতিক ফায়দা হাসিল করার কাজে। ধর্ম থেকে মানুষ না পাচ্ছে পার্থিব কল্যাণ, না পাবে পরকালীন মুক্তি। এর জন্য প্রধানতই দায়ী এই আলেম নামধারী জনগোষ্ঠী। এজন্যই রসুলাল্লাহ বলেছেন, আলেমদের মধ্যে যারা মুত্তাকী ও সৎ তারা সৃষ্টির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আর যারা অসৎ ও দুনিয়ার লোভী তারা সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। [কিমিয়ায়ে সা'দাত-ইমাম গাজ্জালী (রহ.)]

আজকে সাধারণ মানুষ বিকৃত আকীদার কারণে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আলেমদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। ধর্মীয় জীবনে মানুষের চলার পথ আলেমরাই নির্দেশ করে থাকেন, আলেমরা কী বলেন সেদিকেই মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, কেননা আল্লাহই বলেছেন আলেমদের কাছ থেকে অজানা বিষয় জেনে নিতে (নাহল : ৪৩)। সমাজে যখন হাজারো অধর্মের জয়জয়কার, তখন আলেমরাই যদি শত অন্যায় দেখেও নীরবতা পালন করেন, নির্লিপ্ত-নির্বিবাদী জীবনযাপন করেন তাহলে সাধারণ মানুষ তো স্বাভাবিকভাবেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার অনুপ্রেরণা ও সাহস পাবে না। বর্তমানে তেমনটাই হয়েছে। আলেমগণ অন্যায়, অবিচার, যুলুম, নির্যাতন হতে দেখেও নীরবতা পালন করে, নির্লিপ্ত-নির্বিবাদী হয়ে বেঁচে থেকে প্রকৃতপক্ষে দুস্কৃতকারীদের চেয়েও বেশি পাপ করছেন। এর জন্য আল্লাহর কাছে তাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ আখেরি নবীর উম্মাহকে সকল জাতির মধ্যে যে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন সেটা শর্তযুক্ত, নিঃশর্ত নয় এবং জন্মগতও নয়। এই মর্যাদার কারণ এই জাতি মানুষকে ন্যায়কার্যের আদেশ করবে এবং অন্যায়কার্য থেকে প্রতিহত করবে (সুরা ইমরান ১১০)। আমাদের সমাজের আলেমরা সমাজের সকল অন্যায়ের প্রতি নীরব সম্মতি প্রদান করে, সকল অন্যায়কারীর কাছে মাথা নত করে, অপশক্তিগুলোর তোষামোদি করে কোনোমতে দাওয়াত খেয়ে, মাসোহারা নিয়ে জীবনযাপন করে যেতে পারলেই খুশি। নিজেদের দাড়ি, টুপি, জোব্বা আর আরবি ভাষার জ্ঞানের প্রদর্শনী করেই তারা সম্মান দাবি করেন, কিন্তু সম্মান পেতে হলে আল্লাহ যে শর্ত উম্মতে মোহাম্মদীকে দিয়েছেন তারা সেই শর্তপূরণের ধারে কাছেও ঘেঁষতে চান না। কারণ অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে বিপদ আছে, চাকুরি হারাতে হতে পারে, নিশ্চিন্ত উপার্জন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এভাবে ব্যক্তিস্বার্থের কাছে তারা সমাজের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছেন। এ কারণেই রসুলাল্লাহ তাঁর উম্মাহর আলেমদেরকে আসমানের নীচে নিকৃষ্টতম জীব বলে আখ্যায়িত করেছেন [আলী (রা.) থেকে বায়হাকী, মেশকাত]। সমাজের যখন অশান্তির বিস্তার ঘটে, তা দেখেও যে আলেমরা নীরব থাকেন তাদের সেই নীরবতাকে আল্লাহ ঘৃণা করেন। তিনি সুস্পষ্টভাষায় বলেছেন, আলেমরা কেন তাদেরকে (দুষ্কর্মকারীদের) পাপ কথা বলতে এবং হারাম ভক্ষণ থেকে বিরত থাকতে নিষেধ করে না? (সুরা মায়েদা: ৬৩)।

আমরা চাই, আলেমরা কেবল ওয়াজের মাধ্যমে নয়, সঠিক কাজের মাধ্যমে, প্রকৃত এবাদতে নিজেদের প্রাপ্য মর্যাদা প্রমাণ করুন। এটা করলেই তারা সত্যিকার অর্থেই ওরাসাতুল আম্বিয়া বা নবীদের উত্তরাধিকারী হতে পারবেন এবং মানবসমাজে ঈর্ষণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হবেন। মহানবী বলেন, কেবল দুই ব্যক্তির সাথে ঈর্ষা করা যায়। এক. সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন এবং সে সেই সম্পদ সত্য-ন্যায়ের পথে খরচ করে। দুই. সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তার দীনের গভীর জ্ঞান দান করেছেন এবং তার দ্বারা তিনি রায় প্রদান করেন। (সহি বুখারি, মুসলিম, তিরমিজি ও ইবনু মাজাহ)। সুতরাং মর্যাদা পেতে হলে জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রাখলে চলবে না, সেটাকে কাজে লাগিয়ে সত্যকে সত্য ও মিথ্যাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করতে হবে এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের পক্ষাবলম্বন করতে হবে। হেযবুত তওহীদ এই আহ্বানই করছে।

মাননীয় এমামুয্‌যামানের লেখা থেকে সম্পাদিত

ইসলাম শিক্ষার নামে যা হচ্ছে

কয়েক শতাব্দী আগে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানরা যখন সামরিক শক্তিবলে মুসলিম ভূখণ্ড পদানত করে এবং এই মুসলিম নামধারী জনসংখ্যাকে পদানত গোলামে পরিণত করে তখনও এ জাতির অনেকের মধ্যেই ইসলামের চেতনা, আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য ও মুসলিম হিসাবে শ্রেষ্ঠত্বের অনুভূতি কিছু হলেও অবশিষ্ট ছিল, তাদের উপর আল্লাহ ও রসুলের হুকুম কী, এ ব্যাপারে তারা সচেতন ছিলেন অর্থাৎ আগুনের শিখা না থাকলেও ঈমানের উত্তপ্ত কয়লা তখনও গনগন করছিল। এ কারণে খ্রিষ্টানরা ক্ষমতা লাভ করলেও তাদের কর্তৃত্ব নিষ্কণ্টক ছিল না। বিভিন্ন স্থানে স্বাধীনচেতা মুসলিমদের বিদ্রোহ লেগেই ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশের পরিস্থিতিও এর ব্যতিক্রম নয়। হাজী শরিয়তুল্লাহ ও তার পুত্র দুদু মিয়ার ফারায়েজী আন্দোলন, নুরুদ্দিন বাকের মোহাম্মদ জঙ্গের ফকীর সন্ন্যাসী আন্দোলন, ১৮৫৭ এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার ঘটনাগুলি ব্রিটিশ শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এ ঘটনাগুলির প্রত্যেকটিতে ব্রিটিশ অধ্যুষিত ভারতবর্ষকে দারুল হারব (যুদ্ধক্ষেত্র) ঘোষণা দিয়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। হাজার হাজার মুসলিম এসব আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন এবং বহু সংখ্যক জীবন উৎসর্গও করে গেছেন।

এ অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হিসাবে খ্রিষ্টানরা যে কয়টি শয়তানী চক্রান্ত করল তার একটি হচ্ছে মুসলিমদেরকে আল্লাহর সার্বভৌমত্বহীন, সম্পূর্ণরূপে সংগ্রাম বিমুখ, ভীরু, কাপুরুষ এবং খ্রিষ্টান শাসকদের অনুগত নির্বীর্য চরিত্রের মানুষে পরিণত করার জন্য বিকৃত ইসলাম তৈরি করে মাদ্রাসার মাধ্যমে এ জাতির চরিত্রে, আত্মায় গেঁড়ে দেওয়া। (কেরামত আলী জৈনপুরী রচিত মুকাশাফাত-ই-রাহমা গ্রন্থে ১৩ পৃ:)। তারা অনেক গবেষণা করে একটি বিকৃত ইসলাম তৈরি করল যাতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সত্য, ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দেওয়া হলো এবং ব্যক্তিগত জীবনের মাসলা মাসায়েল, ফতোয়া, দোয়া কালাম, মিলাদের উর্দূ ফার্সি পদ্য বিশেষ করে যে বিষয়গুলি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই বহু মতবিরোধ সঞ্চিত ছিল সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করল। এই আত্মাহীন মৃত ইসলামটিকে জাতির মনে মগজে গেঁড়ে দেওয়ার জন্য এই উপমহাদেশের ভাইসরয় **(Viceroy)** বা বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। সেখানে নিজেদের পূর্ণ তত্ত্বাবধানে ১৭৮০ থেকে **১৯২৭ সন পর্যন্ত ১৪৬** বছর ধরে মুসলিম জাতিকে সেই বিকৃত ইসলাম শেখালো। এই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে অংক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বেরিয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রি করে রোজগার করা ছাড়া আর কোনো পথ না থাকে। খ্রিষ্টানরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রি করে উপার্জন করতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত ইসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। খ্রিষ্টানরা তাদের এই পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ করল। তাদের এই মাদ্রাসা প্রকল্পের মাধ্যমে দীনব্যবসা ব্যাপক বিস্তার লাভ করল এবং এর মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যেও হিন্দুদের ব্রাহ্মণ, আচার্য, খ্রিষ্টানদের পাদ্রী, ইহুদিদের রাব্বাই, সাদ্দুসাই, ফরিশি, বৌদ্ধদের শ্রমণ, ভিক্ষুদের মতো একটি স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করল। **এই শ্রেণিটি জাতির সবচেয়ে বড় যে ক্ষতি করল তা হচ্ছে- ধর্মের মূল শিক্ষা, প্রধান লক্ষ্যই যে মানবতার কল্যাণ এই দিকটাকে সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়ে ধর্মকে কেবল ব্যক্তিজীবনের কিছু উপাসনার মধ্যে বেধে ফেলল এবং নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করল। ফলে ধর্মের দ্বারা আর মানবতার কল্যাণ হলো না।**

যাই হোক, দীর্ঘ ১৪৬ বছর (১৭৮০ সালে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ৭০ বছর মুসলিম নামধারী মোল্লাদেরকে অধ্যক্ষ পদে রেখে এবং ১৮৫০ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ৭৬ বছর খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা নিজেরা সরাসরি অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থেকে) এ বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দেবার পর ব্রিটিশরা যখন নিশ্চিত হলো যে, তাদের তৈরি করা বিকৃত ইসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হতে পারবে না, তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলীয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মাওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিল (আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আ. সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, **Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal" by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh),** মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার ইতিহাস, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)। তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদ্রাসার Syllabus ও Curricullum শুধু ঐ মাদ্রাসায় সীমিত না রেখে ব্রিটিশ শাসকরা তা বাধ্যতামূলকভাবে এই উপমহাদেশের সর্বত্র বেশির ভাগ মাদ্রাসায় চালু করল। উপমহাদেশ ভাগ হয়ে পাকিস্তান হবার পর ঐ আলীয়া মাদ্রাসা উভয় পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও খ্রিষ্টানদের তৈরি বিকৃত ইসলামের সেই পাঠ্যক্রমই চালু থাকে; শুধু ইদানীং এতে কিছু বিষয় যোগ করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে মাদ্রাসায় শিক্ষিত দাখেল, ফাযেল ও আলেমরা দীন বিক্রি করে খাওয়া ছাড়াও ইচ্ছা হলে অন্য একটা কিছু করে খেতে পারে। অর্থাৎ মুসলিম বলে পরিচিত পৃথিবীর জনসংখ্যাটি যাতে কোনোদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সেজন্য খ্রিষ্টানরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে তাদের তৈরি যে প্রাণহীন, আত্মাহীন বিকৃত ইসলামটা ১৪৬ বৎসর ধরে শিক্ষা দিয়েছিল সেই বিকৃত, আত্মাহীন ইসলামটাকেই প্রকৃত ইসলাম মনে করে আমরা প্রাণপণে তা আমাদের জীবনে কার্যকরী করার চেষ্টায় আছি।

ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লাদের কাছে থাকা ইসলামটি আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, বরং এটা ব্রিটিশদের শেখানো বিকৃত ও বিপরীতমুখী ইসলাম। প্রকৃত ইসলামটি মুসলিম জাতিকে সমস্ত পৃথিবীর কর্তৃত্বকারী শ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করেছিল আর বর্তমানের বিকৃত ইসলামটি মুসলিমদের নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত, সর্বনিকৃষ্ট দাসজাতিতে পরিণত করেছে; সুতরাং সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় দুটি এক জিনিস নয়। একটা কথা আছে- ফলেন পরিচয়তে।

জান্নাতি ফেরকা:

মৃত জাতির আশার আলো

মোহাম্মদ আসাদ আলী

বর্তমানে মুসলিম নামক এই জনসংখ্যাটির ব্যক্তিগত জীবনের ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার ইলাহ (হুকুমদাতা) হলেন আল্লাহ, আর জাতীয়, রাষ্ট্রীয় জীবনের ইলাহ হলো দাজ্জাল তথা ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'। সমস্ত পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো এই মুসলিম নামধারী জাতিটিও আজ এই প্রতারক 'সভ্যতা'র গোলামে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ দাজ্জালকে প্রভু (রব) বলে মেনে নিয়েছে। দাজ্জালের 'ধর্মনিরপেক্ষ' নীতিকে গ্রহণ করে এই জাতি আজ জাতীয় জীবন থেকে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে কার্যত কাফের-মোশরেকে পরিণত হয়েছে। তাই সমস্ত জাতির উপর দিয়ে বয়ে চলেছে আল্লাহ এবং তাঁর মালায়েকের অভিশাপের ঝড়। এই জাতি পৃথিবীর যেখানেই আছে সেই দেশের মানুষ দিয়ে অত্যাচারিত হচ্ছে, অপমানিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে।

তবে আশার কথা হলো এই কালো অধ্যায়ের পরিসমাপ্তিও সন্নিকটে। কারণ অধঃপতিত মুসলিম নামধারী এই জাতি অচিরেই জেগে উঠবে ইনশা'আল্লাহ। তারা তাদের হারিয়ে যাওয়া আকিদা ফিরে পাবে। শত্রুর অন্তরে ত্রাস সৃষ্টিকারী এবং নিজেদের মধ্যে ভালোবাসায় পরিপূর্ণ চরিত্র তারা আবারো ফিরে পাবে। এর কয়েকটি যৌক্তিক এবং অকাট্ট কারণ রয়েছে।

প্রথম কারণ: রসুলাল্লাহর উপাধী 'রহমাতাল্লিল আলামিন'

আল্লাহ তাঁর রসুলকে কোর'আনে রহমাতাল্লিল আলামিন বলেছেন। 'রহমাতাল্লিল আলামিন' শব্দের অর্থ হলো (পৃথিবীর) জাতি সমূহের উপর (আল্লাহর) রহমত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে আজ পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখুন। কোথায় সে রহমত? পৃথিবীর সর্বত্র অশান্তি, হাহাকার, অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, বুক ভাঙা দুঃখ। মানুষের ইতিহাসে বোধহয় একত্রে একই সঙ্গে দুনিয়ার এত অশ্রু, এত অশান্তি কখনো ঘটে নি। ইতিহাসে ত্রিশ বছরের মধ্যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধ করে ষোল কোটি মানুষ এবং তারপর থেকে এখন পর্যন্ত পাঁচ কোটি মানুষ এত কম সময়ের মধ্যে কখনই হতাহত হয় নি। এত অন্যায়ও মানুষের ইতিহাসে আর কখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। তার চেয়েও বড় কথা, মানবজাতি আণবিক যুদ্ধ করে আজ ধ্বংসের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থা আজকের, বর্তমানের। রসুলাল্লাহর (সা.) পৃথিবীতে আসার চৌদ্দশ' বছর পর। তাহলে তিনি কেমন করে পৃথিবীর মানুষের জন্য রহমত? এর জবাব হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তাঁকে (সা.) যে জীবনব্যবস্থা, দীন দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই দীন মানবজাতির উপর সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করলে যে শান্তি, সুবিচার, নিরাপত্তা মানুষের জীবনে নেমে আসবে সেটা হলো আল্লাহর রহমত, তাঁর দয়া। কারণ তিনি ঐ জীবনব্যবস্থা না দিলে মানুষ কখনই তা নিজেরা তৈরি করে নিতে পারত না, যদি করত তবে তা সীমাহীন অশান্তি আর রক্তপাত ডেকে আনত, যেমন আজ করছে। সেই জীবনব্যবস্থা, দীন, সংবিধান তিনি যার মাধ্যমে মানুষকে দিলেন তাকে তিনি উপাধী দিলেন 'রহমাতাল্লিল আলামিন'। কিন্তু যতদিন না সমগ্র মানবজাতি নিজেদের তৈরি জীবনব্যবস্থা সমূহ পরিত্যাগ করে মোহাম্মদের (সা.) মাধ্যমে প্রেরিত আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করবে ততদিন তারা সেই অশান্তি, অন্যায় (ফাসাদ) ও যুদ্ধ, রক্তপাতের (সাফাকুদ্দিমা) মধ্যে ডুবে থাকবে, আজকের মতো এবং ততদিন বিশ্বনবীর (সা.) ঐ উপাধী অর্থবহ হবে না, অর্থপূর্ণ হবে না এবং আজও হয় নি। তার উম্মাহ ব্যর্থ হয়েছে তার (সা.) উপাধীকে পরিপূর্ণ অর্থবহ করতে। তবে ইনশা'আল্লাহ সেটা হবে, সময় সামনে। স্রষ্টার দেওয়া উপাধী ব্যর্থ হতে পারে না, অসম্ভব। সুতরাং আজ হোক আর কাল হোক সমস্ত মানবজাতি তাঁকে আল্লাহর রসুল হিসাবে মেনে নেবে। এবং তাঁর মাধ্যমে পাঠানো দীনুল হক কে তাদের সমষ্টিগত জীবনে কার্যকর করবে।

দ্বিতীয় কারণ: আসছে নবুয়তের আদলে খেলাফত

আল্লাহর রসুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তোমাদের মাঝে নবুয়ত থাকবে (অর্থাৎ তিনি নিজেই), তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর আসবে নবুয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত। যতদিন আল্লাহ চান ততদিন তা থাকবে তারপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর আসবে মুলকান (রাজতন্ত্র), যতদিন আল্লাহ চান ততদিন তা থাকবে অতঃপর আল্লাহ তা উঠিয়ে নেবেন। তারপর আসবে জাবারিয়াত (শক্তি প্রয়োগ, জোর-জবরদস্তিমূলক শাসন)। এরপর আবারো আসবে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত।" (দালায়েলুম নবুয়াত, বায়হাকী, মুসনাদ-আহমদ বিন হাম্বল,

মেশকাত)

রসুলাল্লাহর এই ভবিষ্যদ্বাণীটি এখন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রথম তিনটি ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। বর্তমানে চলছে জাবারিয়াত অর্থাৎ জোর-জবরদস্তিমূলক শাসন। এর পরেই সামনে আসছে নবুয়াতের পদ্ধতিতে খেলাফত। আল্লাহর রসুলের এই কথা থেকেই বোঝা যায় যে, আখেরি যুগে, অর্থাৎ অদূর ভবিষ্যতে এই জাতি আবারো জাগবে। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন এসে যায় যে, কাদের দ্বারা জাগবে? **কারা এই ঘুমন্ত জাতির কালঘুম ভাঙ্গাবে?**

আল্লাহর রসুল বলেছেন, "আমার উম্মাহর মাঝে সকল সময়ই একদল লোক থাকবে যারা, সর্বাবস্থায় আল্লাহর আদেশ নিষেধ বলবৎ করবে।" এই ফেরকা সম্পর্কেই আল্লাহর রসুল বলেছেন তেহাত্তর ফেরকার মাঝে একমাত্র জান্নাতি ফেরকা। এই জান্নাতি ফেরকাকেই এখন মাঠে নামতে হবে। জাতির কালঘুম ভাঙ্গানোর জন্য তাদের চেতনায় যতবড় আঘাত করার দরকার তাই করতে হবে। এই জান্নাতি ফেরকার কোনো মানুষকে যদি বাকি বাহাত্তর ফেরকার কেউ প্রশ্ন করে যে, আপনি শিয়া না সুন্নি, না আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত, না আহলে হাদিস, হানাফি না শাফেয়ী, মালেকী না হাম্বলী না অন্য কিছু? তবে তার জবাব হবে ভাই, আমি ওসবের কোনোটাই নই। আমি তো শুধু প্রাণপণে চেষ্টা করছি মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মাদী হতে।

জান্নাতি ফেরকার অন্যতম কর্তব্য হবে মুসলিম নামধারী জাতিটিকে প্রশ্ন করা যে, সর্বদা আল্লাহর রসুলের সঙ্গে থেকে, তাঁর সাথে প্রতিটি সংগ্রামে সঙ্গী হয়ে সরাসরি তাঁর কাছে থেকে যারা ইসলাম কী, তা শিখেছিলেন তারাই ঠিক ইসলাম শিখেছিলেন, নাকি আজকের মাওলানারা, মৌলবীরা, পীর মাশায়েখরা যে ইসলাম শেখাচ্ছেন সেটা ঠিক? রসুল (সা.) বর্ণিত জান্নাতি ফেরকার কর্তব্য হবে এই জাতিকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তা আসলে যথেষ্ট নয়। আসল বিষয় হলো চরিত্র এবং আকিদা। একজন পবিত্র চরিত্রের উচ্চ স্তরের মানুষ আর একজন জঘন্য চরিত্রের খুনি, অপরাধীর বাহ্যিক দৃশ্য, চেহারা প্রায় একই রকম। দুজনেরই হাত, পা, মাথা, মুখ সবই আছে। এমনকি ঐ দুশ্চরিত্র খুনীর বাহ্যিক চেহারা ঐ সচ্চরিত্র মানুষের চেহারার চেয়েও সুন্দর হতে পারে। শুধু ভেতরের চরিত্রের জন্যই একজন জান্নাতি আর একজন জাহান্নামী। এমনকি পৃথিবীর বিচারেও একজন সম্মানিত, অন্যজন জেল ফাঁসির উপযুক্ত। বর্তমানে আমরা ইসলাম মনে করে যে দীনটাকে আঁকড়ে আছি এটার বাইরের চেহারা মোটামুটি আল্লাহর রসুলের মাধ্যমে আসা দীনের মতই। বাইরে থেকে যেগুলো দেখা যায় যেমন যেকের, আসকার, নামাজ, রোজা, হজ্ব, দাড়ি, টুপি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নানাবিধ কার্যকলাপ; কিন্তু ভেতরের চরিত্র নবীজীর ইসলামের একেবারে বিপরীত। এছাড়াও জান্নাতি ফেরকার অন্যতম কাজ হবে এই জাতির ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বাহাত্তর ফেরকাকে ডেকে বলা যে, আপনারা যত ফেরকা, মাযহাবে বিভক্ত হয়ে থাকুন আপনারা এক আল্লাহয়, এক নবীতে এবং এক কোর'আনে বিশ্বাসী তো? তাহলে জাতির এই দুঃসময়ে, যখন ঐক্য এতো প্রয়োজনীয়, এখন শুধু এর উপর সবাই একত্র হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ান। মাযহাবের ফেরকার যে অনৈক্য আছে তা যদি বিলুপ্ত করতে না পারেন, তবে ঐক্যের খাতিরে তা ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখে দিন। বাইরে আনবেন না। শিয়া শিয়াই থাকুন। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, এমনকি সামাজিক ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের মাযহাব মেনে চলুন, যত ইচ্ছা মাতম করুন, কিন্তু জাতীয় ক্ষেত্রে, জাতীয় ঐক্যের খাতিরে সুন্নিদের পাশে এসে দাঁড়ান। সুন্নি সুন্নিই থাকুন ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যাপারে, কিন্তু জাতীয়ভাবে শিয়ার পাশে এসে দাঁড়ান। এমনভাবে হানাফি, শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকী ইত্যাদি যত রকমের দুর্ভাগ্যজনক জাতি ধ্বংসকারী বিভক্তি আছে সব ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখে দিয়ে জাতীয় পর্যায়ে এক আল্লাহর, এক নবীতে বিশ্বাসী হিসাবে, এক জাতি হিসাবে এক মঞ্চে এসে দাঁড়ান ও আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম আরম্ভ করুন। শিয়া-সুন্নি উভয়কে বলতে চাই, বর্তমানে আপনারা এই যে পাকিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, বাহরাইন, ইয়েমেন, সৌদিআরবসহ প্রায় সমগ্র মুসলিম-বিশ্বজুড়ে দাঙ্গা চালাচ্ছেন, একে অপরকে গুলি করে হত্যা করছেন; আপনাদের মধ্যে কারা জান্নাতে যাবেন বলুন দেখি? আসলে মহানবীর ভাষ্যমতে কেউই জান্নাতি না। কাজেই আর না, এবার দয়া করে থামুন, যথেষ্ট হয়েছে। এক আল্লাহই, এক রসুলে এবং এক কোর'আনে বিশ্বাসী এই জাতি যদি জান্নাতি ফেরকার এই ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে জান্নাতি ফেরকার কিছুই করার নেই। তারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কাছে সাফ থাকবেন। তবে ডাকের মতো ডাক দিতে হবে। যেমন করে নবী রসুলরা চিরকাল ডাক দিয়ে এসেছেন। তাঁদের প্রচণ্ড বিরোধিতা করা হয়েছে, অপমান করা হয়েছে, নিপীড়ন করা হয়েছে। কিন্তু তাদের ডাক বন্ধ করা যায় নি। শত অত্যাচার সহস্র বিরোধিতা তাদের নিবৃত্ত করতে পারে নি। এই ফেরকার নিরাশ হবার কোনো কারণ নেই। এই ফেরকা জান্নাতি কেন? রসুলাল্লাহর প্রকৃত সুন্নাহ পালনকারী বলেই তো। তাহলে তিনি কত অত্যাচার, কত বিরোধিতা, কত অপমান ও নিগ্রহ সহ্য করেছেন সে সুন্নাহ তো, সে উদাহরণ তো, তাদের সামনেই আছে। তবে ভয় কিসের? জান্নাতি ফেরকা তো আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।

ইসলামের দৃষ্টিতে পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

নতুন ফসল ওঠার আনন্দ-উৎসব কৃষকের স্বতঃস্ফূর্ত। আল্লাহ ইয়াউমুল হাসাদ অর্থাৎ ফসল কাটার দিনে গরিবদেরকে ফসলের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদান বাধ্যতামূলক করেছেন। এই উৎসবের দিনে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন যেন অপচয় করা না হয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি উল্টো দৃশ্য। যেকোনো উৎসবের দিনে ধনীরা অপচয়ের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন আর ব্যবসায়ীরা দিবসটিকেই পণ্যে পরিণত করেন। এসব আনন্দ উৎসবে বিশ্বের অভুক্ত, অর্ধভুক্ত কোটি কোটি মানুষের কোনো অংশ থাকে না। ছবিতে দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি উন্নত দেশে উৎসবের নামে আল্লাহর দেওয়া নেয়ামত ও বরকত ফল-ফলাদির কী নিদারুণভাবে অপচয় করা হচ্ছে। এই কথাটিই আল্লাহ বলেছেন যে, দিবস পালন করো কিন্তু অপচয় করো না। এইসব অনাচার দেখে ধর্মবেত্তারা ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে এই জাতীয় উৎসব পালনকেই হারাম বলে ফতোয়া জারি করেন।

আমাদের দেশের অনেক আলেম ও মুফতির দৃষ্টিতে চৈত্রসংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি উদ্‌যাপন করা প্রকৃতপক্ষে হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি, শেরক ও বে'দাত। এ বিষয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ দ্বিমত রয়েছে। আমরা দু'টি দিক থেকে বিষয়টি উপস্থাপনের চেষ্টা করছি, (ক) ইসলামের আকীদা, (খ) শরিয়াহ।

(ক) ইসলামের আকীদাগত দৃষ্টিকোণ থেকে:

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা সমগ্র মানবজাতির উপযোগী করে আল্লাহ রচনা করেছেন। এতে যে বিধানগুলো স্থান পেয়েছে সেগুলো কোনোটাই কোনো ভৌগোলিক সীমারেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। প্রতিটি জনপদের মানুষের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি থাকে যা তাদের ভৌগোলিক ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিশীল, যা গড়ে ওঠে হাজার হাজার বছরের ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে। ইসলাম কোনো বিশেষ অঞ্চলের সংস্কৃতিকে অন্য অঞ্চলের উপর চাপিয়ে দেয় নি, তেমনি কোনো আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে নিষিদ্ধও করে নি। ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে কেবল অশ্লীলতা, অন্যায় ও আল্লাহর নাফরমানিকে। সে বিচারে আমাদের দেশে আবহমান কাল থেকে চলে আসা নবান্ন উৎসব, চৈত্রসংক্রান্তি বা পহেলা বৈশাখ ইত্যাদি কোনো উৎসবই শরিয়ত পরিপন্থী হতে পারে না। তবে উৎসবের নামে যদি অশ্লীলতা, অপচয় ও অন্যায়ের বিস্তার ঘটানো হয়, সেটা অবশ্যই নিষিদ্ধ। কেননা তার দ্বারা মানবসমাজে অশান্তি সাধিত হবে এবং যা কিছুই অশান্তির কারণ তা-ই যে কোনো জীবনব্যবস্থায় নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে। একজন বাংলাদেশি নেতা বাংলায় কথা বলবেন, বাঙালি পোশাক পরবেন এটাই স্বাভাবিক। তেমনি আল্লাহর শেষ রসুল আরবে এসেছেন, তাঁর আসহাবগণও আরবের মানুষ হিসাবে স্বভাবতই আরবীয় সংস্কৃতির পোশাক, ভাষা, আচার-আচরণ, রুচি-অভিরুচি, খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করতেন। কিন্তু এর সঙ্গে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ আমাদের সমাজে ইসলামী সংস্কৃতির নামে আরবীয় সংস্কৃতি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন: ইসলামের অধিকাংশ আলেমদের সিদ্ধান্তমতে পুরুষের ছতর হলো নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকতে হবে। এখন কেউ যদি ধুতি পরিধান করে তাহলেও কিন্তু তার ছতর আবৃত হয়। কিন্তু ধুতি পরাকে কি আলেমরা ইসলামী সংস্কৃতি বলে মেনে নেবেন? না। তারা চান মানুষকে তেমন জোব্বা পরাতে যেটা আরবের লোকেরা পরে থাকেন।

(খ) শরিয়তের মানদণ্ডের দৃষ্টিকোণ থেকে:

বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কৃষি সংস্কৃতিই বোঝায়। বাংলার কৃষক ধর্মে হিন্দু বা মুসলিম যেটাই হোক, তার জীবনের আনন্দ, বেদনা, উৎসব, আশা-নিরাশার সঙ্গে ফসল ও ফসলী বছরের নিবিড় বন্ধন থাকবে এ কথা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। তাই চৈত্রসংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, নবান্ন উৎসব ইত্যাদি কৃষিনির্ভর বাঙালির জীবনমানের মানদণ্ড।

আসুন দেখা যাক এই উৎসবগুলো কি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ না অবৈধ? শরিয়তের মানদণ্ড হচ্ছে, আল্লাহ নির্দিষ্টভাবে যে বিষয় বা বস্তুগুলোকে হারাম করেছেন তার বাইরে সবই হালাল বা বৈধ। এছাড়া কোনো বিষয় (যেমন একটি উৎসব) হালাল না হারাম তা নির্ভর করে তার উদ্দেশ্য ও ফলাফলের উপর। কোনো কাজের উদ্দেশ্য বা পরিণতি যদি মানুষের অনিষ্টের কারণ হয় তাহলে সেটা কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না। আর যদি তার উদ্দেশ্য হয় মানুষের কল্যাণ তাহলে একে হারাম ফতোয়া দেওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। আমরা পবিত্র কোর'আনে কৃষি-সংস্কৃতির দিবস উদ্‌যাপন প্রসঙ্গে আল্লাহর নীতিমালা জানতে পারি। আল্লাহ বলছেন, তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, জলপাই ও ডালিম জাতীয় ফলও সৃষ্ট করেছেন। এইগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং সাদৃশ্যহীন। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে আর ফসল তোলার দিনে (ইয়াওমুল হাসাদ) এগুলোর হক প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না (সুরা আন'আম, আয়াত- ১৪১)।

এ আয়াতে তিনটি শব্দ লক্ষণীয়, (ক) ফসল তোলার দিন, (খ) হক আদায় করা, (গ) অপচয় না করা। কোর'আনের প্রসিদ্ধ ইংরেজি অনুবাদগুলোতে (যেমন আল্লামা ইউসুফ আলী, মারমাডিউক পিকথল) ফসল তোলার দিনের অনুবাদ করা হয়েছে Harvest day. আয়াতটিতে **আমরা কয়েকটি বিষয় পাচ্ছি:**

১. ফল বা ফসল তোলার দিন এর হক আদায় করতে হবে। সেই হক হচ্ছে- এর একটি নির্দিষ্ট অংশ হিসাব করে গরিব মানুষকে বিলিয়ে দিতে হবে। ফসলের এই বাধ্যতামূলক যাকাতকে বলা হয় ওশর।

২. যেদিন নতুন ফসল কৃষকের ঘরে উঠবে সেদিন স্বভাবতই কৃষকের আনন্দ হবে। যে কোনো আনন্দই পূর্ণতা পায় অপরের মধ্যে তা সঞ্চারিত করার মাধ্যমে। নতুন ফসল তোলার আনন্দের ভাগীদার যেন গরিবরাও হতে পারে সেজন্য তাদের অধিকার প্রদান করে তাদের মুখেও হাসি এনে দিতে হবে। কিন্তু আল্লাহ সাবধান করে দিলেন এই আনন্দের আতিশয্যে যেন কেউ অপচয় না করে।

আমাদের দেশে ফসল কাটার দিনে আনন্দ করা হয়, বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন পার্বণ পালন করা হয়। এ আয়াতের প্রেক্ষিতে দেখা গেল এই দিবসগুলোতে উল্লিখিত কাজগুলো করা ফরদ। কেবল ইসলামের শেষ সংস্করণ নয়, মুসা (আ.) এর উপর যে শরিয়ত নাজেল হয়েছিল সেখানেও আল্লাহ বলেন, "তুমি ফসল কাটার উৎসব অর্থাৎ ক্ষেতে যা কিছু বুনেছ তার প্রথম ফসলের উৎসব পালন করবে। বছর শেষে ক্ষেত থেকে ফসল সংগ্রহ করার সময় ফলসঞ্চয় উৎসব পালন করবে" (তওরাত: এক্সোডাস ২৩:১৬)। সুতরাং আল্লাহর হুকুম মোতাবেকই বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন আঞ্চলিক উৎসব প্রচলিত হয়েছে।

বর্তমানে যেভাবে দিবসগুলো পালিত হচ্ছে:

আমরা জানি যে, ক্রিসমাস, ঈদ, পূজা ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব হলেও বাস্তবে এগুলোর আসল উদ্দেশ্য ধর্মানুরাগ

নয়, গরিবের মুখে হাসি ফোটানোও নয়। এগুলোর নিরেট উদ্দেশ্য বাণিজ্যিক স্বার্থ। পহেলা বৈশাখও তাই। এদিন একটি ৫০০ টাকার ইলিশের দাম হয়ে যায় ১০,০০০ টাকা, যা সেই দরিদ্র কৃষকের ধরাছোঁয়ার সম্পূর্ণ বাইরে থাকে। অপরপক্ষে যারা সারা বছর বার্গার, পিজা খায় তারা এই একদিন মাটির বাসনে পান্তা-ইলিশ খাওয়ার জন্য হা-পিত্তেশ করেন; যেন একদিনের মাতৃভক্তি, দিন শেষ ভক্তি শেষ। ব্যবসায়ী শ্রেণি ও মিডিয়ার প্রচারণায় ভুলে আমাদের তারুণ্যও উন্মাদনা আর অপচয়ে মত্ত হয়ে যাচ্ছে। বহিঃর্বিশ্বেও এমনই হচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার শিনচিলা শহরে প্রতিবছর উদযাপিত তরমুজ উৎসবে হাজার হাজার তরমুজের রস দিয়ে পিচ্ছিল পথ তৈরি করে তাতে স্কি করা হয়। বিভিন্ন দেশে আঙ্গুর, টমাটো ইত্যাদি নিয়েও অপচয়ের মহোৎসব হয়। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন, "খাও, পান কর, কিন্তু অপচয় করো না।... হে রসুল! আপনি বলে দিন, কে হারাম করেছে সাজসজ্জা গ্রহণ করাকে--যা আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন?" (সুরা আরাফ ৩১-৩২)। অর্থাৎ আনন্দ ফুর্তি, সাজগোজ করতে আল্লাহ নিষেধ করেন নি। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ আছে যারা দুর্ভিক্ষপীড়িত, আমাদের দেশেও অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। এই মানুষগুলোর হক আছে আল্লাহ প্রদত্ত সকল ফল ও ফসলে, এই নবান্নে, পহেলা বৈশাখে, চৈত্রসংক্রান্তির পার্বণে। তাদের সেই হক আদায় করা হলেই এই উৎসব হবে পবিত্র দিন। উৎসব আর ঈদ আসলে একই কথা। উৎসবের নামে আজ অর্থের যে নিদারুণ অপচয় হচ্ছে, বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল করা হচ্ছে তা না করে যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক গরিব-দুখী মানুষকে তাদের অধিকার প্রদান করা হতো, তাহলে এ আনন্দ পূর্ণতা পেত, আর এই উৎসবগুলো এবাদতে পরিণত হতো।

শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চাও হতে পারে এবাদতঃ

শিল্প ও সংস্কৃতির পথেও সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ধর্মের অপব্যাখ্যা। আমাদের সমাজে যারা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছেন তাদের অনেকের মধ্যেই একটা দ্বিধা ও অপরাধবোধ আজীবন কাজ করে। কেননা তারা মনে করেন যে, তারা খুব গোনাহের কাজ করছেন। ফলে প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ হচ্ছে না।

আবার অনেক সংস্কৃতিমনা মানুষ ধর্মের নামে চলা কূপমণ্ডুকতাকে মেনে নিতে না পেরে ধর্মবিদ্বেষী হয়ে গেছেন। তারা দেখছেন ধর্মান্ধরা কিভাবে বোমা মেরে সুপ্রাচীন নান্দনিক ভাস্কর্যগুলো গুড়িয়ে দিচ্ছে, সঙ্গীতানুষ্ঠানে, সিনেমা হলে বোমা হামলা করছে। এসব দেখে ধর্মবিদ্বেষীরা ধর্মকেই গালাগালি করছেন ব্লগে, পত্রিকায়, চলচ্চিত্রে, যা ধর্মপ্রাণ মানুষকে আহত করছে, ধর্মব্যবসায়ীরাও পেয়ে যাচ্ছে দাঙ্গা সৃষ্টি করার সুযোগ। তারা খোদ চলচ্চিত্র, ব্লগ ও শিল্পমাধ্যমকেই প্রতিপক্ষে পরিণত করছে।

এই মুহূর্তে পৃথিবীতে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষ আছে যারা দুর্ভিক্ষপীড়িত, আমাদের দেশেও অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। এই মানুষগুলোর হক আছে আল্লাহ প্রদত্ত সকল ফল ও ফসলে, এই নবান্নে, পহেলা বৈশাখে, চৈত্রসংক্রান্তির পার্বণে। তাদের সেই হক আদায় করা হলেই এই উৎসব হবে পবিত্র দিন। উৎসব আর ঈদ আসলে একই কথা। উৎসবের নামে আজ অর্থের যে নিদারুণ অপচয় হচ্ছে, বাণিজ্যিক স্বার্থ হাসিল করা হচ্ছে তা না করে যদি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক গরিব-দুখী মানুষকে তাদের অধিকার প্রদান করা হতো, তাহলে এ আনন্দ পূর্ণতা পেত, আর এই উৎসবগুলো এবাদতে পরিণত হতো।

এ বিষয়ে হেযবুত তওহীদের বক্তব্য হচ্ছে, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি বা শিল্প যে কোনো কিছুরই ভালো-মন্দ নির্ভর করে তার ব্যবহারের উপর। শিল্পের নামে অশ্লীলতা, মিথ্যা ও অন্যায়ের প্রসার শুধু ধর্মে নয় বিশ্বের সমস্ত আইনেও নিষিদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে, কিন্তু সুস্থধারার শিল্পচর্চা নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

আল্লাহর রসুল কি সঙ্গীত, শিল্প-সাহিত্যের প্রতি বিরূপ ছিলেন? না, ইতিহাসের এই ব্যস্ততম মহামানব যাঁর নবী জীবনের প্রায় প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে, তাঁর পক্ষে শিল্পচর্চায় মেতে থাকা সম্ভব ছিল না। তথাপি এত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি গান শুনেছেন। আরবের বিভিন্ন ঐতিহাসিক দিবসে, বিবাহে, যুদ্ধে সর্বত্র গানের চর্চা ছিল, রসুলাল্লাহ সেগুলোকে উৎসাহিত করেছেন। মিনার এক উৎসবের দিন

আবু বকর (রা.) আম্মা আয়েশার (রা.) ঘরে এসে দেখেন দু'টি মেয়ে দফ বা তাম্বুরা সহযোগে গান গাইছে। নবীগৃহে গান-বাজনা দেখে আবু বকর (রা.) কন্যা আয়েশাকে তিরস্কার করতে আরম্ভ করলেন। তখন মহানবী বললেন, 'আবু বকর! ওদেরকে বিরক্ত করো না, আজ ওদের উৎসবের দিন (বোখারি, মুসলিম)। এমন কি আল্লাহর রসুল নিজে একজন আনসার সাহাবির বিয়ের আসরে গায়ক রাখার হুকুম দিয়েছেন, কেননা আনসারেরা ছিলেন গোত্রীয়ভাবে সঙ্গীতপ্রিয়। অথচ বর্তমানে কেবল হামদ-নাত জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াকেই আলেমগণ বৈধ বলে মনে করে থাকেন। তাদের কাছে স্বাধীনতা দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারি বা পহেলা বৈশাখের গান দূরে থাক, কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীতও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

একজন লেখকের কলমের কালি যদি শহীদের রক্তের চেয়ে পবিত্র হতে পারে তবে একজন গায়কের গান যদি মানুষকে মানবকল্যাণে আত্মদান করতে উদ্বুদ্ধ করে, তখন সে গান কেন এবাদত বলে গণ্য হবে না? তাই আল্লাহ যাদেরকে শিল্পপ্রতিভা দান করেছেন তাদেরকে এর হক আদায় করতে হলে এই গুণকে স্বার্থহাসিলের জন্য ব্যবহার না করে মানবতার কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে।

আমরা মানবজাতির সামনে ধর্মের প্রকৃত রূপ ও আত্মার সন্ধান তুলে ধরছি। শান্তি হচ্ছে সেই সত্যধর্মের রূপ যার আত্মা হচ্ছে মানবকল্যাণ। আসুন, আমরা ধর্মের প্রকৃত সত্যের আলোকে মিথ্যাকে চিহ্নিত করি এবং সকল অপসংস্কৃতি, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

হেযবুত তওহীদের বালাগ

শাহারুল ইসলাম

আল্লাহ আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত যত নবী ও রসুল পৃথিবীর বিভিন্ন মানব সম্প্রদায়ের প্রতি প্রেরণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের প্রতি একটি অভিন্ন দায়িত্ব অর্পণ করেছেন, তা হলো বালাগ। নবী ও রসুলগণ প্রত্যেকে তাঁদের স্ব স্ব সম্প্রদায়কে বলেছেন, "আমাদের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে সংবাদ পৌঁছে দেয়া" (সুরা ইয়াসীন ১৭)। এখানে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন "বালাগুল মুবিন" যার অর্থ সুস্পষ্টভাবে পৌঁছানো। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কিছুর সংবাদ পরিষ্কারভাবে পৌঁছে দেওয়াই ছিল নবী-রসুলদের একমাত্র কাজ, কে সেটা গ্রহণ করবে আর কে প্রত্যাখ্যান করবে সেটা তাদের বিবেচ্য বিষয় নয়, সেটা আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মাননীয় এমামুয্‌যামান এর পরিচালনার ক্ষেত্রে রসুলাল্লাহর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাই প্রতিষ্ঠা থেকে আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের প্রধান কাজই হলো বালাগ। আল্লাহ পাক তাঁর অশেষ করুণায় যে মহাসত্যগুলো মাননীয় এমামুয্‌যামানকে জানিয়েছেন তা বিভিন্ন উপায়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই হেযবুত তওহীদের প্রধান কাজ। এখানেও একই কথা, কে সেই মহাসত্য গ্রহণ করবে আর কে প্রত্যাখ্যান করবে তা বিবেচ্য বিষয় নয়, সেটা মহান আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত।

এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কী বালাগ করি? সংক্ষিপ্তভাবে আমাদের বালাগের বক্তব্য হলো এই যে-

ক) মানবজাতির যাবতীয় অশান্তির কারণঃ আজ সমস্ত পৃথিবী অন্যায়, অবিচার আর অশান্তিতে পরিপূর্ণ। পৃথিবীর চারদিক থেকে আর্ত মানুষের হাহাকার উঠছে- শান্তি চাই, শান্তি চাই। দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের উপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের উপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের উপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের উপর ধুর্তের বঞ্চনায়, পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। নিরপরাধ ও শিশুর রক্তে আজ পৃথিবীর মাটি ভেজা। সমস্ত দিক দিয়ে মানুষ অপরাধের সীমা অতিক্রম করেছে, ফলে পৃথিবী অশান্তির অগ্নিগোলকে পরিণত হয়েছে। এই অশান্তি থেকে বাঁচার জন্য চেষ্টা কম হচ্ছে না। কিন্তু ক্রমেই মানুষের আর্তনাদ, হৃদয়বিদারী ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠছে। এই যাবতীয় অশান্তির মূল কারণ হলো পাশ্চাত্য ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা(!) তথা দাজ্জালের তৈরি স্রষ্টাহীন, আত্মাহীন ভোগবাদী প্রচলিত এই সিস্টেম। মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটিসহ সমস্ত মানবজাতি আজ তার সমষ্টিগত জীবন দাজ্জালের তৈরি জীবনব্যবস্থা দিয়ে পরিচালনা করছে। হেযবুত তওহীদের বক্তব্য এই যে, শান্তি, ন্যায়, সুবিচার প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ বর্তমান প্রচলিত জীবনব্যবস্থাগুলো (System) বাদ দিয়ে স্রষ্টার, আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত System গ্রহণ করা এবং তা সমষ্টিগত জীবনে কার্যকর করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। তিক্ত ফলদায়ী বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ছেটে, সেচ-সার দিয়ে, পরিচর্যা করে তা থেকে মিষ্ট ফল আশা করা

নিতান্ত বোকামি। মিষ্ট ফল পেতে হলে ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করে মিষ্ট ফলের বৃক্ষ রোপণ করা অপরিহার্য। ঠিক একইভাবে প্রচলিত সিস্টেমের উৎপাটন ছাড়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

খ) প্রচলিত ইসলাম ইসলাম নয়: বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ইসলাম ধর্ম নামে যে ধর্মটি চালু আছে সেটা আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম নয়। গত ১৪০০ বছর ধরে ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রকৃত ইসলাম ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা বিকৃত ও বিপরীতমুখী হয়ে গেছে। আর চূড়ান্ত বিকৃতি ঘটিয়েছে ঔপনিবেশিক আমলে ব্রিটিশ শাসকেরা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। ব্রিটিশ শাসকেরা মুসলিম নামক এই জনসংখ্যাকে চিরজীবন গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য তওহীদহীন, সংগ্রামহীন, মানবতাহীন বিকৃত ও বিপরীতমুখী একটি ইসলাম তৈরি করে যা বাহ্যিকভাবে দেখতে প্রকৃত ইসলামের মতোই, ঠিক যেন যাত্রাদলের কাঠের বন্দুকের ন্যায়, দেখতে আসল বন্দুকের মতোই কিন্তু সেটি দিয়ে গুলি বের হয় না। প্রকৃত বন্দুকের সাথে যাত্রাদলের কাঠের বন্দুকের যতটুকু সাদৃশ্য, বৈসাদৃশ্য প্রকৃত ইসলামের সাথে বর্তমান প্রচলিত বিকৃত ইসলামেরও ততটাই মিল, অমিল রয়েছে। সেই বিকৃত ইসলাম এই জাতির অস্থি-মজ্জায় ঢুকিয়ে জাতিকে নিবীর্য করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয় কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা। এই কার্যে তারা পূর্ণ সফল হয় এবং পরবর্তীতে এই মাদ্রাসা-শিক্ষা সমগ্র উপমহাদেশ ছাড়াও এই উপমহাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সম্প্রসারিত করে। এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী এই মাদ্রাসা থেকে ব্রিটিশদের তৈরি বিকৃত ইসলাম শিখে ওয়াজ-মাহফিল, মিলাদ, খুতবা ইত্যাদির মাধ্যমে তা সাধারণ মানুষকে শিখিয়েছে আর বিনিময়ে উপার্জন করেছে অঢেল অর্থ। মুসলিম নামক এই জনসংখ্যাটি প্রাণপণে যে ইসলামটি মানার চেষ্টা করছে তা আসলে ব্রিটিশদের তৈরি সেই বিকৃত ইসলাম। আল্লাহ অতি দয়া করে তাঁর প্রকৃত ইসলাম যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়েছেন। হেযবুত তওহীদ সেই প্রকৃত ইসলামের দিকেই মানুষকে আহ্বান করে যাচ্ছে।

গ) দাজ্জাল প্রতিরোধ: আল্লাহর শেষ রসুল আখেরি যামানায় যে এক চক্ষুবিশিষ্ট দানব দাজ্জালের আবির্ভাবের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যাকে ঈসা (আ.) এন্টি ক্রাইস্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন, মাননীয় এমামুয্‌যামান সেই দাজ্জালকে হাদিস, বাইবেল, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের আলোকে সন্দেহাতীতভাবে চিহ্নিত করেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ বস্তুবাদী সভ্যতাই হচ্ছে সেই দাজ্জাল। বর্তমানে সমগ্র মানবজাতি সেই দাজ্জালের তৈরি জীবনবিধান মেনে নিয়ে তার পায়ে সেজদায় পড়ে আছে। পরিণামে তারা একদিকে যান্ত্রিক প্রগতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করলেও মানুষ হিসাবে তারা পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে। সমগ্র মানবজাতি ঘোর অশান্তি, অন্যায়, অবিচারের মধ্যে ডুবে আছে। দাজ্জালের হাত থেকে পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব ছিনিয়ে নিয়ে আল্লাহর হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যই সংগ্রাম করে যাচ্ছে হেযবুত তওহীদ। আল্লাহর রসুল বলেছেন যে, যারা দাজ্জালকে প্রতিরোধ করবে তারা বদর ও ওহুদ দুই যুদ্ধের শহীদের সমান মর্যাদার অধিকারী হবে (আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারী মুসলিম)। হেযবুত তওহীদের যারা দাজ্জালের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে তাদেরকেও আল্লাহ দুই শহীদ হিসাবে কবুল করে নিয়েছেন। যার প্রমাণস্বরূপ তিনি একটি বিরাট মো'জেজা হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। তা হলো- এই দাজ্জাল প্রতিরোধকারীরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের দেহ শক্ত (রাইগরমর্টিস) ও শীতল হয়ে যায় না। জীবিত মানুষের ন্যায় নরম ও স্বাভাবিক থাকে।

ঘ) ধর্মের কোনো বিনিময় নেয়া বৈধ নয়: ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে। ধর্মের কোনো বিনিময় চলে না। বিনিময় নিলে ধর্ম বিকৃত হয়ে যায়। কাজেই ধর্মের কাজ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে করতে হবে এবং বিনিময় নিতে হবে কেবল আল্লাহর কাছ থেকে। কিন্তু আমাদের সমাজে বহু পন্থায় ধর্মকে পুঁজি করে স্বার্থ হাসিল করা হয়। নামাজ পড়িয়ে, কোর'আন খতম দিয়ে, মিলাদ পড়িয়ে, জানাজা পড়িয়ে, খোতবা-ওয়াজ করে, পরকালে মুক্তিদানের জন্য জান্নাতের ওসিলা সেজে অর্থাৎ ইসলামের যে কোনো কাজকে জীবিকার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করাই হলো ধর্মব্যবসা। ইসলামে ধর্মব্যবসার কোনো সুযোগ নেই, আল্লাহ একে সম্পূর্ণরূপে হারাম করেছেন। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলেন-

"আল্লাহ যে কেতাব অবতীর্ণ করেছেন যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে তুচ্ছমূল্য গ্রহণ করে তারা (১) নিজেদের পেটে আগুন ছাড়া কিছুই পুরে না, (২) কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, (৩) আল্লাহ তাদের পবিত্রও করবেন না, (৪) তারা ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, (৫) তারা হেদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা, গোমরাহী ক্রয় করেছে, (৬) তারা দীন সম্পর্কে ঘোরতর মতভেদে লিপ্ত আছে (৭) আগুন সহ্য করতে তারা কতই না ধৈর্যশীল"। (সুরা আল বাকারা: ১৭৫-১৭৬)

মুসলিম নামক এই জনসংখ্যাটির মধ্যে যে শ্রেণিটি বিভিন্নভাবে ধর্মকে রোজগারের পথ হিসাবে ব্যবহার করছে এবং যারা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্যও ধর্মকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করছে তারা আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী নিকৃষ্টতম জাহান্নামী। তাদের অনুসরণ করতে আল্লাহ সরাসরি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "তোমরা তাদের আনুগত্য করো, যারা তোমাদের কাছে বিনিময় চায় না এবং যারা সঠিক পথে আছে।" অর্থাৎ যারা ইসলামের কাজ করে কোনো বিনিময় আশা করে তাদের অনুসরণ

করা আল্লাহর হুকুম-পরিপন্থী। (সূরা ইয়াসীন- ২১)

ঙ) ধর্মের উদ্দেশ্য আজ পাল্টে গেছে: সহজ সরল সেরাতুল মোস্তাকীম দীনুল হক, ইসলামকে পণ্ডিত, আলেম, ফকীহ, মোফাস্‌সেরগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বহু মতের সৃষ্টি করেছে। ফলে একদা অখণ্ড উম্মতে মোহাম্মদী হাজারো ফেরকা, মাযহাব, দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে আছে। অন্যদিকে ভারসাম্যহীন সুফিরা জাতির সংগ্রামী চরিত্রকে উল্টিয়ে ঘরমুখী, অন্তর্মুখী করে নিস্তেজ, নিস্প্রাণ করে দিয়েছে। ফলে একদা অর্ধ-বিশ্বজয়ী দুর্বার গতিশীল যোদ্ধা জাতিটি আজ হাজার হাজার আধ্যাত্মিক তরিকায় বিভক্ত, স্থবির উপাসনাকেন্দ্রিক জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে। এই উভয় শ্রেণির কাজের ফলে ইসলামের উদ্দেশ্যই পাল্টে গেছে। সংগ্রাম করে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার বদলে ধর্মের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আত্মার উন্নয়ন এবং জীবনের ব্যক্তিগত অঙ্গনের ছোট খাটো বিষয়ের মাসলা মাসায়েল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করা।

চ) ঐক্যবদ্ধ হতে হবে: একটি জাতির শ্রেষ্ঠত্ব, সমৃদ্ধি ও কল্যাণের পূর্ব শর্ত হচ্ছে জাতির ঐক্য। যে জাতি যত বেশি ঐক্যবদ্ধ সে জাতি তত বেশি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা জাতীয় ঐক্য হারিয়ে শান্তি, উন্নতি ও প্রগতি থেকে বহু দূরে অবস্থান করছি। আমাদের এই জাতীয় ঐক্যভঙ্গের কারণ প্রধানত দু'টি।

প্রথমত, ধর্মজীবীদের দ্বারা সৃষ্ট বিভক্তি। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক পরাশক্তিগুলো নিজেদের দেশে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র না মানলেও ঐসব বিভক্তি সৃষ্টিকারী মতবাদ চাপিয়ে দিয়ে আমাদেরকে রাজনৈতিকভাবে শত শত দলে বিভক্ত করে দিয়েছে এবং এই অনৈক্যের সুযোগে আমাদেরকে শাসন ও শোষণ করে চলছে। এই সব রাজনৈতিক দল ও মতবাদের অনুসারীরা নিজেদের স্বার্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির নামে সন্ত্রাস, সহিংসতা, মানুষ হত্যা, হরতাল, অবরোধ, জ্বালাও পোড়াও করে দেশের মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিসহ করে তুলে বার বার। আমরা মনে করি এ থেকে বাঁচার একটাই পথ - ১৬ কোটি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদেরকে (১) অপরাজনীতির বিরুদ্ধে, (২) সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে, (৩) রাজনৈতিক দলাদলি, হানা-হানির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা মানবতাবিনাশী সমস্ত দল-মত পরিত্যাগ করে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক জাতি, এক পরিবারে পরিণত হবো। আমরা রাজনীতির নামে সহিংসতা, ধর্মের নামে অরাজকতা আর দেখতে চাই না, আমরা চাই শান্তি, নিরাপত্তা ও স্বস্তি। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হই তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে যা দিয়েছেন সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমাদেরকে কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ও ন্যায়ের পক্ষে যদি আমরা ইস্পাতের মতো ঐক্যবদ্ধ হয়ে যোগ্য নেতৃত্বের অধীনে পিঁপড়ার মতো সুশৃঙ্খল ও মালায়েকের মতো আনুগত্যশীল হতে পারি তবে এই ষোল কোটি মানুষ এমন এক বজ্রশক্তিধর জাতিতে পরিণত হবো যারা সর্বদিক দিয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির আসন অধিকার করবে। সমগ্র পৃথিবী তখন এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে ইনশা'আল্লাহ।

ছ) ধর্ম ও এবাদতের সঠিক আকীদা: ধর্ম শব্দের অর্থ ধারণ করা। কোনো বস্তু বা প্রাণি যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ ধারণ করে সেটাই হচ্ছে তার ধর্ম। আগুনের ধর্ম পোড়ানো। পোড়ানোর ক্ষমতা হারালে সে তার ধর্ম হারালো। মানুষের ধর্ম কী? মানুষের ধর্ম হচ্ছে মানবতা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্যের দুঃখ-কষ্ট হৃদয়ে অনুভব করে এবং সেটা দূর করার জন্য আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালায় সে-ই ধার্মিক। অথচ প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট লেবাস ধারণ করে সুরা কালাম, শাস্ত্র মুখস্থ বলতে পারে, নামায-রোযা, পূজা, প্রার্থনা করে সে-ই ধার্মিক।

এবাদত কী? আল্লাহর এবাদত করার জন্যই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে (সুরা যারিয়াত ৫৬)। এবাদত হচ্ছে যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে সেই কাজটি করা। গাড়ি তৈরি হয়েছে পরিবহনের কাজে ব্যবহারের জন্য, এটা করাই গাড়ির এবাদত। আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রতিনিধি (Representative) হিসাবে (সুরা বাকারা-৩০)। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিকে আল্লাহ যেভাবে সুশৃঙ্খল, শান্তিপূর্ণ রেখেছেন ঠিক সেভাবে এ পৃথিবীকে শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল রাখাই মানুষের এবাদত। ধরুন আপনি গভীর রাত্রে প্রার্থনায় মগ্ন। হঠাৎ পাশের বাড়ি থেকে 'আগুন আগুন' বলে আর্তচিৎকার ভেসে এল। আপনি কী করবেন? দৌড়ে যাবেন সাহায্য করতে নাকি চোখ-কান বন্ধ করে প্রার্থনা চালিয়ে যাবেন। যদি আগুন নেভাতে যান সেটাই হবে আপনার এবাদত। আর যদি ভাবেন- বিপন্ন ব্যক্তি অন্য ধর্মের লোক, তাহলে আপনার মধ্যে মানুষের ধর্ম নেই, আপনার নামায-রোযা, প্রার্থনা সবই পণ্ডশ্রম।

জ) ধর্মবিশ্বাসের সঠিক ব্যবহার: আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ কোনো না কোনো ধর্মে বিশ্বাসী। তাদের এই ধর্মবিশ্বাস এক বিরাট শক্তি। বর্তমানে এ জাতির ঈমান, আমল সবই পরকালের সুন্দর জীবনের আশায় অথচ তাদের দুনিয়ার জীবন দুর্দশায় পূর্ণ অর্থাৎ অসুন্দর। কারণ তাদের ধর্মবিশ্বাস ধর্মব্যবসায়ীদের দ্বারা মানবজাতির অকল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদেরকে বুঝতে হবে, যে ঈমান দুনিয়াতে নিপীড়িত মানুষের মুক্তি ও শান্তির কাজে লাগে না সে ঈমান আখেরাতেও জান্নাত দিতে পারবে না। এজন্যই আল্লাহ আমাদেরকে দোয়া করতে শিখিয়েছেন, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুনিয়ার জীবনকে সুন্দর, মঙ্গলময় করো এবং আমাদের আখেরাতের জীবনকেও সুন্দর, মঙ্গলময় করো এবং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো (সুরা বাকারা ২০১)।" সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে কেউ বিরাট অর্থ-সম্পত্তির মালিক হচ্ছে আবার কেউ ভোটের বাক্স পূর্ণ করছে। জঙ্গিবাদীরা তাদের কার্যক্রমের বিস্তার ঘটাচ্ছে এই ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়েই। এখন মানুষের ধর্মবিশ্বাস তথা ঈমানকে সঠিক পথে (To right track) পরিচালিত করা গেলে তা জাতির উন্নতি-প্রগতি-সমৃদ্ধির কাজে লাগবে। মানুষকে যদি ধর্ম, এবাদত, মানবজনমের স্বার্থকতা, ঈমান ইত্যাদি বিষয়গুলোর সঠিক আকীদা বোঝানো যায় তবেই তা সম্ভব হবে।

ঝ) ইলাহ ও মাবুদের পার্থক্য: আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এ কলেমায় কখনোই "ইলাহ" শব্দটি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। নিঃসন্দেহে আল্লাহই আমাদের একমাত্র উপাস্য মা'বুদ, স্রষ্টা, পালনকর্তা, তবে এগুলো স্বীকার করে নেওয়া এই দীনের ভিত্তি নয়, কলেমা নয়। বরং কলেমা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে না মেনে কেউ মো'মেন হতে পারবে না।

কলেমায় ব্যবহৃত 'ইলাহ' শব্দের প্রকৃত অর্থ, 'যাঁর হুকুম মানতে হবে' (He who is to be obeyed)। শতাব্দীর পর শতাব্দীর কাল পরিক্রমায় যেভাবেই হোক এই শব্দটির অর্থ 'হুকুম মানা বা আনুগত্য' থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'উপাসনা, বন্দনা, ভক্তি বা পূজা করা (He who is to be worshiped) হয়ে গেছে। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় খ্রিষ্টানদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোতে কলেমার অর্থই শেখানো হয় - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। কোর'আনের ইংরেজি অনুবাদগুলোতেও কলেমার এই অর্থই করা হয় (There is none to be worshiped other than Allah)। অসঙ্গতিটি দিবালোকের মতো পরিষ্কার। 'উপাস্য' কথাটির আরবি হচ্ছে 'মা'বুদ', তাই "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই" এই বাক্যটিকে আরবি করলে দাঁড়ায় "লা মা'বুদ ইল্লাল্লাহ', যা ইসলামের কলেমা নয়। কোনো অমুসলিম এই সাক্ষ্য দিয়ে মুসলিম হতে পারবে না। কলেমার 'ইলাহ' শব্দটির অর্থ ভুল বোঝার ভয়াবহ পরিণতি এই হয়েছে যে সম্পূর্ণ মুসলিম জনসংখ্যাটি এই দীনের ভিত্তি থেকেই বিচ্যুত হয়ে কাফের-মোশরেক হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, 'ইলাহ' শব্দের অর্থ পাল্টে যাওয়ায় এই মুসলিম জনসংখ্যার কলেমা সংক্রান্ত ধারণাই পাল্টে গেছে। বর্তমানে এই জাতির আকিদায় আল্লাহর হুকুম মানার কোনো গুরুত্ব নেই, তাঁর উপাসনাকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে।

মাননীয় এমামুয্‌যামানের নির্দেশনা অনুযায়ী এই বালাগ কার্যক্রম আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সম্পন্ন করেছি। প্রথমে আমরা শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লায়, হাটে-বাজারে, রাস্তায়-মাঠে-ঘাটে মানুষের কাছে গিয়ে মৌখিকভাবে সত্য বোঝানোর চেষ্টা করেছি, হ্যান্ডবিল, বই দিয়ে পড়তে অনুরোধ করেছি। কখনো ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতদের মাঝে বালাগ করেছি কখনো বা অপরিচিত জায়গাতে গিয়ে দল বেঁধে বালাগ করেছি। নির্বাচন কমিশন থেকে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ম্যাপ সংগ্রহ করে সেই ম্যাপ দেখে দেখে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বালাগ করেছি। চেষ্টা করেছি অপরিচিত সেই শহর, নগর, গ্রামের একটি বাড়িও যেন সত্যের বালাগ থেকে বঞ্চিত না হয়। প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ, চৈত্রের দাবদাহ, বর্ষা-বাদল সমস্ত কিছু উপেক্ষা করে আমাদের বালাগ অব্যাহত থেকেছে।

২০০৮ সালে মহান আল্লাহ পবিত্র মো'জেজা ঘটানোর মাধ্যমে মাননীয় এমামুয্‌যামান ও হেযবুত তওহীদের সত্যায়ন করেন। এরপর থেকে

বালাগের ব্যাপকতা আরও বৃদ্ধি করা হয়। মাননীয় এমামুয্‌যামানের লেখা "দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা!" বইটি বাস-টার্মিনাল, ট্রেন-স্টেশন, লঞ্চ-ঘাট ছাড়াও দেশব্যাপী প্রায় সকল প্রকারের যানবাহনে হকারির মাধ্যমে বালাগ করা হয়। উক্ত বইয়ের ওপর নির্মাণ করা হয় "দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতা!" শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র এবং পরবর্তীতে "দাজ্জাল প্রতিরোধকারীর মৃত্যু নাই" শীর্ষক আরও একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করা হয়। দেশব্যাপী সর্বাত্মকভাবে চলতে থাকে প্রামাণ্যচিত্রের সিডি-ডিভিডি, মাননীয় এমামুয্‌যামানের লেখা বই সমূহ এবং হ্যান্ডবিলের বালাগ। বই, সিডি-ডিভিডি, হ্যান্ডবিলের বালাগ একদিকে যেমন চলতে থাকে হকারির মাধ্যমে একইসাথে পায়ে হেঁটে মানুষের বাড়িতে বাড়িতে গিয়েও আমরা বালাগ করি। বিভিন্ন বইয়ের দোকান, সিডির দোকানে মার্কেটিংয়েরও চেষ্টা করা হয়। রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বইমেলাগুলোতে স্টল নিয়ে আমরা আমাদের প্রকাশনাসমূহ প্রচার করার প্রয়াস করি। একইসাথে আমরা ইন্টারনেটে ফেসবুক, টুইটার, ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে হাজার হাজার আইডি থেকে এই মহাসত্যগুলো প্রচার করতে থাকি। ২০১০ সালের শেষের দিকে এসে আমরা সারাদেশে ভ্যান, পিকাপ ইত্যাদি ভাড়া করে মাইকিংয়ের মাধ্যমে বালাগ করি তবে একইসাথে ব্যক্তিগত বালাগও সবসময় চলতে থাকে। এরপর আমরা দেশব্যাপী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছে বালাগ করি। তাদের বাড়িতে গিয়ে, অফিসে গিয়ে আমাদের সম্পর্কে জানানোর চেষ্টা করি, মাননীয় এমামুয্‌যামানের লেখা বই-পুস্তক, প্রমাণ্যচিত্রের সিডি-ডিভিডি ও হ্যান্ডবিল দিয়ে তাদের কাছে মহাসত্য পৌঁছে দেবার চেষ্টা করি।

মাননীয় এমামুয্‌যামানের নির্দেশনা অনুযায়ী এভাবেই চলছিল হেযবুত তওহীদের বালাগ কার্যক্রম। বালাগের প্রতিটা ধাপে, প্রতিটা পর্বে হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ-মোজাহেদাগণ নানামুখী বাধার সম্মুখীন হয়েছেন এবং অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। সবচেয়ে বেশি বাধা এসেছে এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী মোল্লাদের কাছ থেকে। সমস্ত আইন মান্য করে সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে বালাগ করা সত্ত্বেও এক শ্রেণির ধর্মব্যবসায়ী মোল্লা শ্রেণি এবং পাশ্চাত্য-প্রভাবাধীন ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়া আমাদের বিরুদ্ধে নানা অপপ্রচার চালিয়েছে, ষড়যন্ত্র করেছে। তাদের ষড়যন্ত্রে আমাদের উপর অনেকবার হামলা করা হয়েছে, বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, ক্ষেতের ফসল কেটে নেওয়া হয়েছে, পুকুরের মাছ বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে এমনকি আমাদের উপর হামলা করে দুইজনকে শহীদ করা হয়েছে। সহস্রাধিকবার আমাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, পাঁচ শতাধিক মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো অপরাধের প্রমাণ না পেয়ে বিজ্ঞ আদালত প্রতিবার তাদের অব্যাহতি প্রদান করেছে।

২০১২ সালের ১৬ জানুয়ারি আমাদেরকে কাঁদিয়ে মহামান্য এমামুয্‌যামান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। এরপর আল্লাহর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হেযবুত তওহীদের এমামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি জনাব হুসাইন মোহাম্মদ সেলিম। মাননীয় এমামুয্‌যামান বালাগের ক্ষেত্রে যে নবতর বিপ্লবের সূচনা করে গিয়েছিলেন তারই ধারাবাহিকতায় হেযবুত তওহীদের এমাম শুরুতেই দেশব্যাপী আমাদের বালাগ ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকল মোজাহেদ-মোজাহেদাগণকে বাড়ি-ঘর ছেড়ে বহিরাগত হয়ে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দেন। খুব দ্রুতই মোজাহেদ-মোজাহেদাগণ বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় সকল জেলায় হেযবুত তওহীদের বালাগ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। তারা সেখানে থেকে উপার্জনের জন্য কাজ করেন ও সত্যপ্রচারের বালাগ করতে থাকেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যোগাযোগ করে মাননীয় এমামুয্‌যামানের লেখা প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাপানোর চেষ্টা করি। সেই লেখাগুলো পত্রিকাতে প্রচার করা হয় এবং আমরা নিজেরাই হকারি করে পত্রিকার মাধ্যমে বালাগ করতে থাকি।

২০১২ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে দৈনিক নিউজ পত্রিকার মাধ্যমে শুরু হয় হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে পত্রিকা প্রকাশ যারা প্রধান লক্ষ্যই ছিল মহাসত্যের বালাগ। বালাগ কার্যক্রম আরও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে একে একে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে যাত্রা শুরু করে আরও দুটি পত্রিকা দৈনিক দেশেরপত্র ও দৈনিক বজ্রশক্তি, একটি অনলাইন পত্রিকা বাংলাদেশেরপত্র.কম, একটি অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল জেটিভি অনলাইন। প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের জন্য খোলা হয় মিডিয়া হাউজ 'ইলদিরিম মিডিয়া'। বালাগের এ পর্যায়ে এসে হেযবুত তওহীদ ও হেযবুত তওহীদ কর্তৃক পরিচালিত মিডিয়াগুলো উদ্যোগে দেশব্যাপী সেমিনার, আলোচনা অনুষ্ঠান, মতবিনিময় সভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, গোলটেবিল বৈঠক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে আমাদের বক্তব্য পৌঁছে দিতে সক্ষম হই। অনুষ্ঠানগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, সাংসদ, বিচারপতি, সাংবাদিক, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, কণ্ঠশিল্পী, অভিনেতাসহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আমাদের বক্তব্যের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আমাদের প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী দেখে দেশের আপামর জনগণ আমাদের সাথে দু'হাত তুলে ঐকমত্য প্রকাশ করেন। এখন পর্যন্ত আমরা এই বালাগ চালিয়ে যাচ্ছি।

দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান’ শীর্ষক আলোচনা সভার খণ্ডচিত্র

নোয়াখালী

গত ১৬ এপ্রিল নোয়াখালী মাইজদী পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণকেন্দ্রে (বি.আর.ডি.বি) হলরুমে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে ‘ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান’ শীর্ষক আলোচনা সভা ও সুধী সমাবেশে মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) এ্যাড. নুর আলম জিকু, এ.পি.পি. জজ কোর্ট, নোয়াখালী; এ্যাড. আলহাজ্ব ওমর ফারুক, সভাপতি, সুবর্ণচর উপজেলা আওয়ামী লীগ; নীলুফা মমিন, ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা), সদর উপজেলা পরিষদ নোয়াখালী; এ্যাড. শিহাব উদ্দিন শাহিন, চেয়ারম্যান, সদর উপজেলা পরিষদ, নোয়াখালী; রুফায়দাহ পন্নী, উপদেষ্টা দৈনিক বজ্রশক্তি ও সাবেক সম্পাদক দৈনিক দেশেরপত্র; মোঃ নিজাম উদ্দিন, আমীর, হেযবুত তওহীদ, নোয়াখালী জেলা এবং শফিকুল আলম উখবাহ্, হেযবুত তওহীদের মুখপাত্র ও নির্বাহী সম্পাদক দৈনিক বজ্রশক্তি।

মাদারীপুর

গত ১৮ এপ্রিল মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলায় হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন (প্রথম সারিতে বাম থেকে) আব্দুল কুদ্দুস মিয়া, দপ্তর সম্পাদক, রাজৈর থানা আওয়ামী লীগ; খন্দকার আব্দুল মতিন, সভাপতি, রাজৈর প্রেসক্লাব, মাদারীপুর; নুরুল হক খান, সভাপতি, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ, রাজৈর উপজেলা, মাদারীপুর; মসীহ উর রহমান, আমীর, হেযবুত তওহীদ; প্রধান অতিথি শাজাহান খান, চেয়ারম্যান রাজৈর উপজেলা পরিষদ, মাদারীপুর; সেকান্দার আলী শেখ মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার, রাজৈর উপজেলা, মাদারীপুর; ডা: মাহবুব আলম মাহফুজ, আমীর, বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চল হেযবুত তওহীদ; মো: রুহুল আমিন, আমীর, মাদারীপুর অঞ্চল হেযবুত তওহীদ।

দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে আয়োজিত ‘ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান’ শীর্ষক আলোচনা সভার খণ্ডচিত্র

মানিকগঞ্জ

গত ২১ এপ্রিল মানিকগঞ্জের সিংগাইল উপজেলায় হেযবুত তওহীদের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা সভায় (বাম দিক থেকে) সিংগাইর পৌর কাউন্সিলর রিপন আক্তার, সিংগাইর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মো: ছাইদুল ইসলাম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো: ওবায়দুল হক, হেযবুত তওহীদের মানিকগঞ্জ জেলা আমির রুহুল আমিন মৃধা, হেযবুত তওহীদের কেন্দ্রীয় সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক রিয়াদুল হাসান, প্রধান অতিথি উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মাজেদ খান, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মো: আব্দুস সালাম খান, উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো: শহিদুর রহমান, উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মো: রমিজ উদ্দিন। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো: মোসলেম উদ্দিন।

মৌলভীবাজার

গত ২৭ এপ্রিল মৌলভীবাজারের রাজনগরে আয়োতিজ আলোচনা সভায় বাম দিক থেকে মো. ফরজান আহমেদ, সভাপতি, স্বেচ্ছাসেবকলীগ, রাজনগর উপজেলা; মো. ফয়সল আহমেদ, সাংগঠনিক সম্পাদক, রাজনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ; বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. জামাল উদ্দীন, কমান্ডার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা ইউনিট কমান্ড, মৌলভীবাজার; প্রধান অতিথি বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আছকির খান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, রাজনগর, মৌলভীবাজার; মিহির কান্তি দাস (মনজু), ৪নং পাঁচগাও ইউপি চেয়ারম্যান, রাজনগর; বীর মুক্তিযোদ্ধা সজল কুমার চক্রবর্তী, কমান্ডার, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড; মুখ্য আলোচক মো. রিয়াদুল হাসান, সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সাহিত্য বিভাগ, হেযবুত তওহীদ; (পেছনের সারিতে বাম দিক থেকে) মো, সাতির মিয়া, ৩নং মুন্সীবাজার ইউপি চেয়ারম্যান, রাজনগর; মো. মিলন বখত, ৮নং মনসুরনগর ইউপি চেয়ারম্যান ও যুবলীগ সভাপতি, রাজনগর উপজেলা; মো. নাজমুল হক (সেলিম), ৭নং কামারচাক ইউপি চেয়ারম্যান, রাজনগর; নুরুল আবসার সোহাগ, আমির, হেযবুত তওহীদ, মৌলভীবাজার; জনাব মো. ইকবাল অধ্যক্ষ, মাওলানা মোফাজ্জল হোসেন মহিলা ডিগ্রি কলেজ, রাজনগর।

তওহীদ ছাড়া সকল আমল অর্থহীন

তওহীদ জান্নাতের চাবি

মাহবুব আলী

সমাজে একটি কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে- "নামাজ বেহেস্তের চাবি।" এই কথাটি কোর'আন বা হাদিসে নেই। কে, কখন এটি চালু করল তার কোনো সূত্র না পাওয়া গেলেও সর্বনাশ যা হয়েছে তা হলো এই যে, মুসলিম নামক এই জাতি সমাজ ও রষ্ট্রের যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য ছেড়ে দিয়ে শুধু নামাজ নিয়েই ব্যস্ত। এদেরে জাতীয় জীবন থেকে তওহীদ একেবারেই হারিয়ে গেছে- সেদিকে তাদের খেয়ালই নেই। অথচ হাদিসে আছে তওহীদই হলো জান্নাতের চাবি।

মহানবী (সা.) বলেছেন- "জান্নাতের চাবি হচ্ছে- আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা (ইলাহ) নেই" (মুয়াজ বিন জাবাল থেকে আহমদ, মেশকাত)। অপর হাদীসে এসেছে- যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে "আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা (ইলাহ) নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) তাঁর প্রেরিত" তার জন্য জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। (ওবাদাহ বিন সাবেত থেকে মুসলিম, মেশকাত)। এছাড়াও অনেক হাদীস থেকে দেখানো যাবে যে, তওহীদই জান্নাতের চাবি। কলেমা তথা তওহীদের স্বীকৃতি না দিলে যেমন মো'মেন মুসলিম থাকা যায় না ঠিক তেমনই স্বীকৃতি দানের পর আবার তওহীদের ওপর থেকে সরে গেলেও আর মো'মেন মুসলিম থাকা যায় না, আর এটা সবাই জানে যে, মো'মেন মুসলিম না থাকলে সে জান্নাতে যেতে পারবে না, সে যতই এবাদত করুক। দীনুল হকের ভিত্তি হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই কলেমাটি, এ নিয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই। তওহীদ ব্যতীত কোনো ইসলামই হতে পারে না, তওহীদই ইসলামের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে, মুসলিম বলে পরিচিত এই জনসংখ্যাটি তওহীদ সম্পর্কে যে ধারণা করে (আকীদা) তা ভুল। তাদের কাছে তওহীদ মানে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করা এবং তাঁর এবাদত বা উপাসনা করা। 'তওহীদ' এবং 'ওয়াহদানিয়াহ্' এই আরবি শব্দ দু'টি একই মূল থেকে উৎপন্ন হলেও এদের অর্থ এক নয়। 'ওয়াহদানিয়াহ্' বলতে বোঝায় মহাবিশ্বের স্রষ্টা আল্লাহ যে একজন তা বিশ্বাস করা (একত্ববাদ-Monotheism), পক্ষান্তরে 'তওহীদ' মানে ঐ এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া, তাঁর ও কেবলমাত্র তাঁরই নিঃশর্ত আনুগত্য করা। আরবের যে মোশরেকদের মধ্যে আল্লাহর শেষ রসুল এসেছিলেন, সেই মোশরেকরাও আল্লাহর একত্বে, ওয়াহদানিয়াতে বিশ্বাস করত, কিন্তু তারা আল্লাহর হুকুম, বিধান মানতো না অর্থাৎ তারা আল্লাহর আনুগত্য করত না। তারা তাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবন নিজেদের মনগড়া নিয়ম-কানুন দিয়ে পরিচালনা করত। এই আইনকানুন ও জীবনব্যবস্থার উৎস ও অধিপতি হিসাবে ছিল বায়তুল্লাহ, কা'বার কোরায়েশ পুরোহিতগণ। মূর্তিপূজারী হওয়া সত্ত্বেও তাদের এই ঈমান ছিল যে, এ বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ একজনই এবং তাদের এই ঈমান বর্তমানে যারা নিজেদেরকে মো'মেন মুসলিম বলে জানে এবং দাবি করে তাদের চেয়ে কোনো অংশে দুর্বল ছিল না (সুরা যুখরুফ ৯, আনকাবুত ৬১, লোকমান ২৫)। কিন্তু যেহেতু তারা আল্লাহর প্রদত্ত হুকুম মানতো না, তাই তাদের ঐ ঈমান ছিল অর্থহীন, নিষ্ফল এবং স্বভাবতঃই আল্লাহর হুকুম না মানার পরিণতিতে তাদের সমাজ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, নিরাপত্তাহীনতা, সংঘর্ষ ও রক্তপাতে পরিপূর্ণ ছিল, এ জন্য আরবের ঐ সময়টাকে আইয়্যামে জাহেলিয়াত বলা হয়। তাদের স্রষ্টা আল্লাহর হুকুমের প্রতি ফিরিয়ে আনার জন্যই

তাদের মধ্যে রসুল প্রেরিত হয়েছিলেন। রসুলও সে কাজটিই করেছিলেন, ফলশ্রুতিতে অন্যায়-অশান্তিতে নিমজ্জিত সেই সমাজটি নিরাপত্তা, ন্যায়বিচার, সুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ শান্তিময় (ইসলাম অর্থই শান্তি) একটি সমাজে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং আল্লাহর আনুগত্য না করাই ছিল তাদের কাফের-মোশরেক হওয়ার প্রকৃত কারণ। বর্তমানের মুসলিমরা উপলব্ধি করতে পারছে না যে প্রাক-ইসলামিক যুগের আরবের কাঠ-পাথরের মূর্তিগুলোই এখন গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদির রূপ ধরে আবির্ভূত হয়েছে এবং মুসলিম জনসংখ্যাটি আল্লাহর পরিবর্তে এদের তথা এদের প্রবর্তক ও পুরোধা 'পুরোহিতদের' আনুগত্য করে যাচ্ছে। এই প্রতিটি তন্ত্র আলাদা আলাদা একেকটি দীন (জীবনব্যবস্থা), ঠিক যেমন দীনুল হক 'ইসলাম'ও একটি জীবনব্যবস্থা। পার্থক্য হলো, এই মানবরচিত দীনগুলো মানবজীবনের বিশেষ কিছু অঙ্গনের, বিশেষ কিছু বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু সঠিক সমাধান দিতে পারে না আর ইসলাম মানবজীবনের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় থেকে শুরু করে সামষ্টিক অঙ্গনের সকল বিষয়ে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা দিয়ে থাকে। বর্তমানের মুসলিম নামক জনসংখ্যাটি এই সকল মানবরচিত তন্ত্রের প্রতিমার আনুগত্য করে সেই পৌত্তলিক আরবদের মতই মোশরেক ও কাফেরে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর রসুল এসে মোশরেক আরবদেরকে আল্লাহর তওহীদের ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সেখানে আল্লাহর একত্ববাদ (ওয়াহদানিয়াত) প্রতিষ্ঠা করেন নি, কারণ আল্লাহর একত্ববাদের বিষয়ে সেই মোশরেকদের আগে থেকেই সুদৃঢ় ঈমান ছিল (সুরা ইউসুফ- ১০৬)। তারা তাদের দেবদেবীর কোনোটিকেই আল্লাহ মনে করত না, স্রষ্টা বা প্রভুও ভাবতো না, তারা সেগুলোর পূজা করত এই বিশ্বাসে যে সেগুলো তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে এবং তাদের হয়ে বিভিন্ন বিষয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে (সুরা ইউনুস- ১৮, সুরা যুমার-৩)। সুতরাং মূর্তি পূজার নেপথ্যে তাদের প্রকৃত উপাস্য আল্লাহই ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে যে মতবাদগুলোর আনুগত্য করা হচ্ছে এর মধ্যে কোথাও আল্লাহর স্থান নেই, এগুলো আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কেই সম্পূর্ণ নির্বিকার। ফলে বর্তমানের মো'মেন মুসলিম হবার দাবিদারগণ যে শেরক ও কুফরে লিপ্ত তা নিঃসন্দেহে ১৪০০ বছর আগের আরবদের শেরক ও কুফরের চেয়েও নিকৃষ্টতর।

এই যে আমি পৃথিবীর দেড়শো কোটি মানুষকে কার্যতঃ মোশরেক ও কাফের বলছি, আমার এ কথার গুরুত্ব ও দায়িত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তবে পাঠককে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগে এ বক্তব্যের পক্ষে যে যুক্তিগুলো পেশ করছি সেগুলো একটু গভীরভাবে ভেবে দেখার জন্য। যদি এ জনসংখ্যাটি সত্যিই মো'মেন, মুসলিম ইত্যাদি হয়ে থাকে তাহলে কোর'আনের অনেক আয়াত মিথ্যা হয়ে যায়, যা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আল্লাহ ওয়াদা করেছেন- তোমরা যদি মো'মেন হও তবে পৃথিবীর কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে দেবো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলাম (সুরা নূর ৫৫)। তাঁর ওয়াদা যে সত্য তার প্রমাণ নিরক্ষর, চরম দরিদ্র, সংখ্যায় মাত্র পাঁচ লাখের উম্মতে মোহাম্মদীর হাতে তিনি অর্ধ-পৃথিবীর কর্তৃত্ব তুলে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন হলো, আমরা নিজেদের মো'মেন বলে দাবি করি, তাহলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর কর্তৃত্ব, আধিপত্য আমাদের হাতে নেই কেন? সেই সর্বশক্তিমান কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অসমর্থ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক)? তিনি আরও বলেছেন, তিনি মো'মেনদের ওয়ালি (বাকারা ২৫৭)। ওয়ালি অর্থ- অভিভাবক, বন্ধু, রক্ষক ইত্যাদি। আল্লাহ যাদের ওয়ালি তারা কোনোদিন শত্রুর কাছে পরাজিত হতে পারে? তারা কোনোদিন পৃথিবীর সর্বত্র অন্য সমস্ত জাতির কাছে লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে পারে? তাদের মা-বোনরা শত্রুদের দ্বারা ধর্ষিতা হতে পারে? অবশ্যই নয়। এর একমাত্র জবাব হচ্ছে- আমরা যতোই নামাজ পড়ি, রোযা রাখি, যতোই হাজার রকম এবাদত করি, যতোই মুত্তাকী হই, আমরা মো'মেন নই, মুসলিম নই, উম্মতে মোহাম্মদী হবার তো প্রশ্নই ওঠে না।

এর কারণ এই জনসংখ্যাটি ইসলামের ভিত্তি থেকেই সরে গেছে। ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, এটাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত এ কলেমাই এই দীনের অপরিবর্তনীয় ভিত্তি যাতে কোনো দিনই "ইলাহ" শব্দটি ছাড়া অন্য কোনো শব্দই ব্যবহৃত হয় নি। আল্লাহই আমাদের একমাত্র উপাস্য, স্রষ্টা, পালনকর্তা তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে এগুলো স্বীকার করে নেওয়া এই দীনের ভিত্তি নয়, কলেমা নয়। বরং কলেমা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আল্লাহকে ইলাহ হিসাবে না মেনে কেউ মো'মেন হতে পারবে না।

কলেমায় ব্যবহৃত 'ইলাহ' শব্দের প্রকৃত অর্থ, 'যাঁর হুকুম মানতে হবে' (He who is to be obeyed)। শতাব্দীর পর শতাব্দীর কাল পরিক্রমায় যেভাবেই হোক এই শব্দটির অর্থ 'হুকুম মানা বা আনুগত্য' থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে 'উপাসনা, বন্দনা, ভক্তি বা পূজা করা (He who is to be worshiped)। যেভাবে 'হেদায়াহ' (সঠিক দিক নির্দেশনা) শব্দটি প্রায়োগিক অর্থে 'তাকওয়া'য় রূপান্তরিত হয়েছে, আকীদা আর ঈমান অভিন্ন বিষয়ে পরিণত হয়েছে ঠিক সেভাবেই ইলাহ শব্দের অনুবাদ পৃথিবীর সর্বত্র মা'বুদ বা উপাস্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় খ্রিষ্টানদের

প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোতে কলেমার অর্থই শেখানো হয় - লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মানে আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। কোর'আনের ইংরেজি অনুবাদগুলোতেও কলেমার এই অর্থই করা হয় (There is none to be worshiped other than Allah)। এর ভেতরকার ভুল এবং অসঙ্গতিটি দিবালোকের মত পরিষ্কার। 'উপাস্য' কথাটির আরবি হচ্ছে 'মা'বুদ', তাই "আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই" এই বাক্যটিকে আরবি করলে দাঁড়ায় "লা মা'বুদ ইল্লাল্লাহ', যা কখনও ইসলামের কলেমা হয় নি, আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত কোনো নবীই এই কলেমা নিয়ে আসেন নি, কোনো অমুসলিম এই কলেমা পড়ে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ (উপাস্য) নেই' ঘোষণা দিয়ে মুসলিম হতে পারবে না। এই ভুলের পরিণাম যে কত সুদূরপ্রসারী ও দুর্ভাগ্যজনক দেখুন! কলেমার 'ইলাহ' শব্দটির অর্থ ভুল বোঝার ভয়াবহ পরিণতি এই হয়েছে যে সম্পূর্ণ মুসলিম জনসংখ্যাটি এই দীনের ভিত্তি থেকেই বিচ্যুত হয়ে গেছে, ফলে তারা আর মো'মেন নেই। তারা শুধু যে ইসলামের সীমানা থেকে বহির্গত হয়ে কাফের-মোশরেক হয়ে গেছে তাই নয়, এই ভুলের আরও মারাত্মক এক পরিণতি হয়েছে। সেটা হলো 'ইলাহ' শব্দের অর্থ পাল্টে যাওয়ায় এই মুসলিম জনসংখ্যার কলেমা সংক্রান্ত ধারণাই (Conception, আকীদা) পাল্টে গেছে, যে মহাগুরুত্বপূর্ণ আকীদা ভুল হলে সকল ফকীহগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, সকল আমল অর্থহীন হয়ে যায়, এমনকি ঈমানেরও কোনো মূল্য থাকে না। বর্তমানে এই জাতির আকীদায় আল্লাহর হুকুম মানার কোনো গুরুত্ব নেই, তাঁর উপাসনাকেই যথেষ্ট বলে মনে করা হচ্ছে। কলেমার অর্থ সম্পর্কে এই ভুল আকীদা এই জনসংখ্যার আত্মায় এবং অবচেতন মনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে গেছে। ফলে সারা দুনিয়াতে এমন কোনো দল নেই, এমন কোনো রাষ্ট্র নেই যারা তাদের সামষ্টিক, জাতীয় জীবনে আল্লাহর হুকুম মেনে চলছে, যা কিনা ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর আদেশ নিষেধ মানার চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। জাতীয় জীবনে আল্লাহকে অমান্য করে তার বদলে উপাসনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি দিয়ে আসমান জমিন ভর্তি করে ফেলা হচ্ছে, কিন্তু সেই পর্বত সমান উপাসনাও বিশ্বময় তাদের করুণ দুর্দশার প্রতি দয়াময় আল্লাহর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হচ্ছে, বিজাতির হাতে তাদের অবর্ণনীয় নিপীড়ন, লাঞ্ছনা, পরাজয়, অপমান, নিগ্রহ বন্ধ তো হচ্ছেই না, বরং দিন দিন আরো বেড়ে চলছে।

'ইলাহ' শব্দের অর্থ যে 'আনুগত্য করা', উপাসনা করা নয় তা কোর'আনের বহু আয়াত থেকে বোঝা যায়। সুরা ফাতাহ'র ১৭নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'যে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের আনুগত্য করে আল্লাহ তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।' এখানে জান্নাতে যাওয়ার পূর্বশর্ত আল্লাহ দিলেন, যে আনুগত্য করে, বললেন না যে, 'এবাদত, উপাসনা করে।' এখানে তিনি অন্য কোনো আমলের কথাও বললেন না, না সালাহ কায়েম, না যাকাত প্রদান, না হজ্ব, না সওম, অন্যান্য ছোটখাটো আমলের তো কথাই নেই। তিনি জান্নাত প্রদানের ওয়াদা করলেন শুধুই তাঁর এবং তাঁর রসুলের আনুগত্যের বিনিময়ে। সুরা নেসার ৬৯নং আয়াতটি দেখুন, আল্লাহ বলছেন, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের হুকুম মান্য করবে সে নবী, শহীদ, সিদ্দিক ও সালেহীনদের সঙ্গে (অর্থাৎ জান্নাতে) থাকবে।' এখানেও 'আনুগত্য করা' ছাড়া আর কোনো শর্ত আল্লাহ দেন নি। সুতরাং কলেমায় ব্যবহৃত 'ইলাহ' শব্দের অর্থ 'উপাস্য' হওয়া সম্ভব নয়, এর অর্থ অবশ্যই 'যার আনুগত্য করা হয়, হুকুম পালন করা হয়'। আল্লাহর দাবি হচ্ছে, প্রথমে মানুষকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে হবে যে আল্লাহ যা হুকুম করবেন তাই সে মেনে নিবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে। তারপর এই চুক্তি বাস্তবায়নকল্পেই সে আল্লাহর এবাদত করতে বাধ্য, কারণ আল্লাহর হুকুম হচ্ছে একমাত্র তাঁরই এবাদত করা। তাহলে বোঝা গেল, প্রথম কাজ আল্লাহর আনুগত্য মেনে নেওয়া, তারপরে তাঁর এবাদত করা। সুরা আম্বিয়ার ২৫ নং আয়াতটি দেখুন, আল্লাহ বলছেন, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই, সুতরাং তাঁর এবাদত করো।" যদি এবাদত করাই প্রথম ও প্রধান কাজ হতো তাহলে আয়াতটি হতো এমন যে, "আল্লাহ ছাড়া মা'বুদ (এবাদত, বন্দনা পাওয়ার অধিকারী) কেউ নয়, সুতরাং তাঁরই আনুগত্য করো", আরবিতে লা মা'বুদ ইল্লাল্লাহ, ফা আত্তাবিয়্যুহু। কিন্তু কোর'আনে এমনটা একবারও বলা হয় নি। সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ 'ইলাহ' এবং 'মা'বুদ' শব্দ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন কারণ এদের অর্থও সম্পূর্ণ আলাদা।

মোটকথা, এই ১৫০ কোটির জনসংখ্যাটি, যারা নিজেদেরকে কেবল মুসলিমই নয়, একেবারে মো'মেন ও উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, তারা এগুলোর কোনোটিই নয়, তারা কার্যত মোশরেক এবং কাফের। আল্লাহ বলছেন, 'আল্লাহ যা নাযেল করেছেন সে অনুযায়ী যারা হুকুম (বিচার ফায়সালা) করে না তারা কাফের, জালেম, ফাসেক (সুরা মায়েদা ৪৪, ৪৫, ৪৭)। এই আয়াতগুলোতে 'হুকুম' শব্দটি দিয়ে কেবল আদালতের বিচারকার্যই বোঝায় না, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক অর্থাৎ সামগ্রিক জীবন তাঁর নাযেল করা বিধান অর্থাৎ কোর'আন (এবং সুন্নাহ) মোতাবেক পরিচালনা করাকেও বোঝায়। মো'মেন মুসলিম হবার দাবিদারগণ এখন আর একটি সু-সংহত উম্মাহরূপে নেই, তারা ভৌগোলিকভাবে পঞ্চাশটিরও বেশি জাতিরাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান, ইহুদি ও পৌত্তলিকদের দাসে

পরিণত হয়েছে, তাই তারা তাদের সামষ্টিক কার্যাবলী আল্লাহর নাযেলকৃত বিধান দিয়ে ফায়সালা করে না। ফলশ্রুতিতে তারা ফাসেক (অবাধ্য), জালেম (অন্যায়কারী) এবং কাফেরে (প্রত্যাখ্যানকারী) পরিণত হয়েছে। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানগুলোকে অপাংক্তেয় করে রেখে তারা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আইন, কানুনগুলো নিজেদের দেশে প্রবর্তন করে তা দিয়ে সামষ্টিক কার্যাবলী পরিচালনা করছে।

এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি যে তওহীদ ও দীন যে দুটি ভিন্ন বিষয় এবং এ দুটির তফাৎ কি। তওহীদ হচ্ছে ভিত্তি এবং দীন হচ্ছে এই ভিত্তির উপর নির্মিত অবকাঠামো, দালান। তওহীদ হচ্ছে, "একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করা এবং প্রতিটি বিষয়ে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা। সংক্ষেপে জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর ও তাঁর রসুলের (সা.) হুকুম মানা, প্রতিটি বিষয়ে যেখানেই তাঁর কোনো বক্তব্য আছে তা বিনা প্রশ্নে, বিনা দ্বিধায় মেনে নেওয়া। যে বিষয়ে তাঁর অথবা তাঁর রসুলের কোনো বক্তব্য নেই সে বিষয়ে, তা ব্যক্তিগত হোক বা সমষ্টিগত, আমরা স্বাধীনভাবে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি।"

আল্লাহর প্রতি লাখো কোটি শুকরিয়া যে তিনি আবার এই হারিয়ে যাওয়া তওহীদ ও সত্যদীনের প্রকৃত আকীদা যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ২০০৮ এর ২ ফেব্রুয়ারি আল্লাহ বিরাট এক মো'জেজার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হেযবুত তওহীদ হচ্ছে আল্লাহর সেই মনোনীত দল যার মাধ্যমে সারা দুনিয়ার সকল অন্যায়-অশান্তি নির্মূল হয়ে অনাবিল শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে ইনশা'আল্লাহ।

নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য

ফাহমিদা পান্না

সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদানকে উল্লেখ না করে কোনো উপায় নেই। অধিকাংশ মহৎ কাজের স্বীকৃতি ও পুরস্কার পুরুষ সগৌরবে গ্রহণ করলেও তার সাফল্যের জন্য পর্দার অন্তরালে থেকে নীরবে কাজ করে গেছে কোনো না কোনো নারী, অন্ধ সমাজের দৃষ্টি খুব কমই সেই নারীর দিকে আকৃষ্ট হয়। সেই নারী হয়তো মা, হয়তো স্ত্রী, হয়তো বোন, হয়তো বা কন্যা। নজরুল লিখেছেন:

কত মাতা দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিল সেবা,
বীরের স্মৃতি-স্তম্ভের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা?
কোনো কালে একা হয়নি কো জয়ী পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়াছে, শক্তি দিয়াছে বিজয়লক্ষ্মী নারী।

কোনো স্বীকৃতি তো নেইই- উল্টো আজকের এই সভ্যতার মুখোশ পরা সমাজে নারীরা পদে পদে হচ্ছেন নির্যাতিত, নিষ্পেষিত। প্রতিদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হচ্ছে নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক ঘটনা। কেন? এটাতো হওয়ার কথা ছিল না। আজকের সমাজ যেন ১৪০০ বছর আগের আরবের সেই আইয়ামে জাহেলিয়াতকেও হার মানিয়েছে। সে সময় কন্যা সন্তান জন্ম নিলে পিতা-মাতা লজ্জাস্কর পরিস্থিতিতে পড়ে যেত। অনেকে সদ্যজাত কন্যা শিশুকে মাটিচাপা দিয়ে দিত। পিতা-মাতার সম্পত্তিতে তাদের কোনো অধিকার স্বীকৃত ছিল না। নারীর চরম অবমাননার এই যুগে ইসলাম এসেছিল

নারীর মুক্তির বার্তা নিয়ে। পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রের সর্বত্র নারীর অবাধ বিচরণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলাম যা আজ থেকে এক শতাব্দী আগে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতেও ছিল অচিন্তনীয়। সেই বর্বরতার যুগকে স্বর্ণযুগে পরিণত করেছিলেন আল্লাহর শেষ রসুল। না। কোনো মন্ত্রবলে নয়। আল্লাহ তাঁর কাছে যে জীবনব্যবস্থা পাঠিয়েছিলেন সেটা বাস্তবায়নের ফলেই অর্ধ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চূড়ান্ত ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ও অনাবিল শান্তি। সেই ইসলাম আর আজকের ইসলাম এক নয়। এ কারণে তার ফলও সম্পূর্ণ বিপরীত, চরম অশান্তি। মাননীয় এমামুয্‌যামান, জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী কোর'আন হাদীস ও ইতিহাস থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণ করেছেন যে সেই ইসলাম বিকৃত হতে হতে এখন চূড়ান্ত বিকৃত, সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে গেছে।

নারী ও পুরুষ মানবজাতির মধ্যে দু'টি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সৃষ্টি। তাদের উভয়কেই আল্লাহ তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসাবে সৃষ্টি করলেও তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য পৃথক। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টির পর জান্নাতের অঢেল সুখ ও শান্তিময় পরিবেশে বসবাস করতে দিলেন। সেখানে তাঁর ছিল যেখানে খুশি যাওয়ার, যা খুশি খাওয়ার, যা খুশি করার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা। এত কিছু পেয়েও আদম (আ.) এর হৃদয়ে বিরাজ করছিল এক অদ্ভুত শূন্যতার অনুভূতি। জান্নাতের এত সুখ-সম্ভোগ ও রঙ-রূপ-রসও তাঁকে আনন্দ দিতে পারছিল না, সব কিছু অর্থহীন, বিবর্ণ, নিরস মনে হচ্ছিল। তখন আল্লাহ তাঁরই পাঁজড়ের হাড় থেকে সৃষ্টি করলেন তাঁর সঙ্গিনী এবং সাহায্যকারী হাওয়াকে (বাইবেল- জেনেসিস ২:২২)। মা হাওয়াকে পেয়ে শান্তির সুধারসে আদমের হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল। এরপর আল্লাহর একটি হুকুম অমান্য করায় আল্লাহ তাঁদের উভয়কে শাস্তি-স্বরূপ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। শাস্তি হলো, পুরুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করে পরিবারের ভরণপোষণ করবে আর নারী গর্ভযাতনা সহ্য করবে, সন্তান লালন পালন করবে (বাইবেল- জেনেসিস ৩:১৬-১৭)। আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা হিসাবে তাদের উভয়েরই জীবনের লক্ষ্য আল্লাহ ঠিক করে দিলেন। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য কেবল পারিবারিক জীবনেই নয়, জীবনের সর্ব অঙ্গনের জন্য আল্লাহ নারীকে পুরুষের সঙ্গী এবং সাহায্যকারী হিসাবে নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি নারীকে সৃষ্টিই করেছেন রহমত, বরকত ও নেয়ামতে পূর্ণ করে। এজন্যই আল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে থেকে সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া।" (আর-রূম ২১) আর আল্লাহর রসুল বলেছেন, সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর নেয়ামত আর সম্পদরাশিতে পূর্ণ এবং সেই সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে মঙ্গলময় সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ও নেয়ামত হচ্ছে সেই স্ত্রী যে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের প্রতি সদা সতর্ক (সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড ৩৪৫৬)। এই হচ্ছে নারীকে আল্লাহ প্রদত্ত সৃষ্টিগত মর্যাদা।

নারী কেবল তার স্বামীর জন্য শান্তির প্রতিমূর্তি নয়, জান্নাতকে যেভাবে সে শান্তিময় করে তুলেছিল, ঠিক সেভাবে মানবসমাজের প্রতিটি অঙ্গনের যেখানেই সে যাবে সেখানেই সে শান্তির সুবাস ছড়িয়ে দেবে। সে মা হিসাবে সন্তানের জন্য মমতার আশ্রয়, বোন হিসাবে ভাইয়ের জন্য আদরিনী আর স্নেহের আধার, স্ত্রী হিসাবে সে স্বামীর জন্য প্রেমময়, ঘরের কর্ত্রী, বার্ধক্যের অবলম্বন। কন্যা হিসাবে সে পিতা-মাতার জন্য নিরন্তর আনন্দের ফল্গুধারা। যে ঘরে, সমাবেশে, যে কর্মকাণ্ডে নারী নেই সেটা প্রাণহীন। তাদের আগমনেই মানবজীবনের প্রতিটি অঙ্গন শান্তিময় হয়ে উঠবে। সেই নারীদেরকে আজ কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে? যার ভিতরে মনুষ্যত্ব আছে সে কি একটি প্রস্ফুটিত গোলাপকে জুতার তলায় মাড়িয়ে যেতে পারে? অথচ আজ অতুলনীয় সৌন্দর্য ও শান্তির উৎস যে নারী, সেই নারীকে আজ দাসী হিসাবে গণ্য করা হয়। তাদের উপর নির্মম পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়। এই অবস্থার সূত্রপাত কোথায়?

আদমের (আ.) পর থেকে পৃথিবীতে যখন মানুষের বিস্তার হলো আল্লাহ তাদের শান্তিতে জীবনযাপনের জন্য নবী রসুলদের মাধ্যমে তাঁর বিধান পাঠাতে থাকলেন। সেই বিধানগুলো মানুষ যখন মেনে চলত তাদের সমাজে অনাবিল শান্তি বিরাজ করত। কিন্তু নবীদের প্রস্থানের পর একটি শ্রেণির জন্ম হয়েছে প্রতিটি জাতির মধ্যে যারা ঐ বিধানের অর্থাৎ ধর্মের ধারক বাহক সেজে বসেছে। তারা নিজেদের পার্থিব স্বার্থে আল্লাহর বিধানকে বিকৃত করে ভারসাম্যহীন করে ফেলেছে। ফলে ধর্মই হয়ে দাঁড়িয়েছে নিষ্ঠুর নির্যাতনের কল। সেই বিকৃত বিধানের ফলে সমাজের শান্তিময় পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে। কোমলমতি নারীরা স্বভাবতই সামাজিক নিষ্ঠুরতার প্রথম শিকারে পরিণত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ স্নেহবঞ্চিত নিরাশ্রয় নারীকে রুজি রোজগারের জন্য কঠোর পরিশ্রমের কাজের দিকে, প্রতিকূল পরিবেশ মোকাবেলার দিকে ঠেলে দেয়। যে কাজগুলো তার দেহ কাঠামো ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় সেগুলো করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই তার চরিত্রে কোমলতার বদলে আসে পুরুষালী রুক্ষতা, তার কীন্নর কণ্ঠ হয়ে যায় কর্কশ, নারী তার সৌন্দর্য, মাধুর্য ও বৈশিষ্ট্য হারায়। গত ৪ জুন ডেইলি স্টার পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, আমাদের গ্রাম বাংলার অনেক নারী কৃষিক্ষেত্রে দিনমজুরি করছেন। একজন পুরুষ দিনমজুর সারাদিন রৌদ্রে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে যে

পরিশ্রমের কাজগুলো করেন একজন নারী দিনমজুরও সমান পরিশ্রমের কাজ করেন। তারা স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। অথচ প্রতিবেদক এটা লেখেন নি এই নারীরা নারী হিসাবে তাদের যে জীবন প্রাপ্য ছিল তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, পাশাপাশি পুরুষালি কাজগুলো করে তারা তাদের নারীসুলভ চারিত্রিক ও শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলো হারাচ্ছেন। এর জন্য কেবল দারিদ্র্যই দায়ী নয়।

'আধুনিক' পশ্চিমা সমাজের নারী পুরুষরা এখন মানুষের জীবন বাদ দিয়ে জীবজন্তুর মত ইন্দ্রিয়সম্ভোগের জীবন বেছে নিয়েছে। দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'র বস্তুবাদী জীবনের আকর্ষণ, সম-অধিকার, স্বাধীনতা জাতীয় প্রহেলিকামূলক মতবাদ, আর্থিক উৎকর্ষের পেছনে ছুটে ছুটে আমাদের নারী সমাজের বড় একটি অংশও তাদের সৃষ্টিগত আত্মিক ও বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য হারিয়েছেন, তাদের সৌন্দর্য, করুণা, দয়া-মায়া, শিষ্টাচার, নম্রতা, লাজ-লজ্জা সবই প্রায় খুইয়েছেন। তবে এটা অনস্বীকার্য যে নারীর এই বিবর্ণতার পেছনে প্রধান কারণ পুরুষ সমাজের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।

ইসলামের সকল বিষয় যেমন বিকৃত হয়ে গেছে তেমনি সমাজে নারীর অধিকার, সম্মান, দায়িত্ব, কাজের আওতা সম্পর্কে সঠিক ধারণাও হারিয়ে গেছে। ধর্মের নামে তথাকথিত আলেম সমাজ জবরদস্তিমূলক একটি অপ্রাকৃতিক ব্যবস্থা নারীর উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে গৃহবন্দী করে রাখতে চাইছে। একটি জাতির মধ্যে অর্ধেকই নারী, কাজেই অর্ধেক জনসংখ্যাকে ঘরে বন্দী করে রেখে, অন্তর্মুখী করে রেখে কোনো জাতি কখনো উন্নতি করতে পারে না। এক পা ছাড়া যেমন হাঁটা যায় না, তেমনি অর্ধেক জনসংখ্যাকে বাদ দিয়ে জাতির উন্নতি প্রগতির সকল প্রচেষ্টাই মুখ থুবড়ে পড়বে এটাই স্বাভাবিক।

একটি জাতির ধ্বংস অনিবার্য হয় কখন?

আশেক মাহমুদ

সৃষ্টির আদীকাল থেকেই এই বিশাল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড মৌলিক কিছু শাশ্বত নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। এ সত্য নীতিগুলো অক্ষুণ্ন আছে বলেই ইতিহাসের বহু চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে আজও পৃথিবী নামক গ্রহটি টিকে আছে, মানুষ নামের প্রাণীটি তার বিস্তৃত বক্ষে পদচারণ করছে। পৃথিবীর এমনই এক শাশ্বত বিধান হলো- কোনো কিছুর প্রাচুর্যতা (abundance) ও অভাবের (scarcity) পারস্পরিক সম্পর্ক। সৃষ্টির এই অখণ্ডনীয় বিধান অনাদীকাল থেকে চলে আসছে যে, কোনো বস্তুর প্রাচুর্যতা চূড়ান্ত পর্যায়ে (Final Stage) পৌছানোর অর্থ হলো অতি স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে ওই বস্তুর অভাব বা ঘাটতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছবে। এ কথার সত্যতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সমস্ত প্রকৃতিতে। প্রাচুর্যতা যে কোনো জিনিসেরই হোক তার একটি নির্ধারিত সীমা (Limitation) থাকে, এই সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া অর্থ হচ্ছে তার ঘাটতি শুরু হওয়া। আকাশে ছোঁড়া তীর তার সর্বোচ্চ সীমা অবধি পৌছার পর সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ভূমিতে পতিত হয়, কেউ তাকে চূড়ান্ত সীমায় থামিয়ে রাখতে পারে না। একইভাবে নদীতে আসা জোয়ার অনাগত ভাটার সংবাদ বহন করে। আবার গাছে গাছে, গৃহে গৃহে সুমিষ্ট পাকা আমের ছড়াছড়ি, এমনকি রাস্তাঘাট, দোকানপাট, যানবাহন সর্বত্র বিরাজিত পাকা আমের প্রাচুর্যতা আমাদের সতর্ক করে দেয় যে, কিছুদিনের মধ্যে এমন সময় আসছে যখন সারা দেশ খুঁজেও একটি পাকা আম পাওয়া যাবে না। নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, ডোবা, হাওর-বাওড়, ক্ষেত-খামার মাছে মাছে টৈটুম্বুর হয়ে গেলে তা এই সংকেতই বহন করে যে, নিশ্চিতভাবে এমন সময় আসছে যখন খুব সন্ধান করেও আপনি মাছের দেখা পাবেন না। প্রখর সূর্যের আলোয় ঝলমলে দিন সাক্ষ্য দেয় অত্যাসন্ন রাতের গূঢ় অন্ধকারের। অর্থাৎ বস্তুর প্রাচুর্যতাই তার আসন্ন দীনতার সংকেত (symbol) বহন করে। আবার এই নেতিবাচক সত্যকে ইতিবাচকভাবে দেখলে এটাও ঠিক যে, বস্তুর দীনতাও তার আসন্ন প্রাচুর্যতার সংকেত বহন করে।

যে সত্য প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে সেই একই সত্য মানবজীবনেরও নিয়ন্ত্রক তাতে সন্দেহ নেই। আজ মানবজাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও চারিত্রিক অবস্থা কী? কাউকে বলে দিতে হবে না মানুষ নামের এই প্রাণীটি অন্যায়, অবিচার, অনৈক্য, হানাহানি, সন্ত্রাস, সহিংসতা, যুদ্ধ, সংঘাত, রক্তপাত এক কথায় অশান্তির সূচকে মানব ইতিহাসের সর্বোচ্চ স্থানে উপনীত হয়েছে। অন্যদিকে ন্যায়, সত্য, শান্তি আশ্রয় নিয়েছে সর্বনিম্ন স্থানে। পৃথিবী পরিণত হয়েছে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে। প্রতিটি মানুষ সেখানে কেবল স্বার্থের পূজারী। বনের জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে যেটুকু সহমর্মিতা রয়েছে, উদারতা রয়েছে, মানুষ নামের এই প্রাণীর মধ্যে যেন তাও নেই। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সর্বত্র কেবল মিথ্যার জয়জয়কার। সর্বত্র

সত্য নির্বাসিত, ন্যায় পরাজিত, মনুষ্যত্ব অধঃপতিত, ধর্ম অবহেলিত এবং নীতি উপেক্ষিত। মানব ইতিহাসে আজকের মতো এত অন্যায়, অবিচার, অপরাধ আর কখনও হয় নি। অসত্য ও অশান্তির এই প্রাচুর্যতা এবং সত্য ও শান্তির এই হীনতা কীসের আলামত? আমরা মনে করি এ পরিস্থিতি অত্যাসন্ন অসত্যের ধ্বংস এবং সত্য প্রতিষ্ঠার সংকেত বহন করছে।

যে তীর একবার ধনুক থেকে আকাশ অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তাকে পুনরায় ভূমিতে ফিরে আসতে হবে এটাই চিরসত্য। ওই তীর কেবল ততক্ষণ উর্ধ্বাভিমুখে গতি ধরে রাখতে পারবে যতক্ষণ তার চূড়ান্ত বিন্দুতে না পৌঁছে। একবার চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছে গেলেই শুরু হবে তার পতনের পালা। কোনো শক্তিই তার পতন ঠেকাতে পারবে না। পৃথিবীর অশান্তি নামক তীর বছরের পর বছর উর্ধ্বাভিমুখে ছুটে আজ চূড়ান্ত বিন্দুতে (The final point) পৌঁছেছে, কাজেই পতন তার আবশ্যক। অধর্মের বিষ পান করে কোটি কোটি মানুষের শরীর বিষাক্ত হয়ে গেছে। এই বিষাক্ত মানবগোষ্ঠী থেকে সুস্থ-সুন্দর প্রজন্ম আশা করা যায় না। হয় তাদের বিষমুক্ত হতে হবে, নয়তো মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাদের রচিত সমাধিতে উড়বে নব সভ্যতার বিজয়কেতন। এটা এমন এক মহাসত্য যার কোনো ব্যত্যয় নেই, বিকল্প নেই। এটা আমাদেরই দু'হাতের কামাই।

আজ পৃথিবীতে মানুষ গিজগিজ করছে, মানুষের আধিক্যে বড় বড় শহরে পা ফেলার জায়গা নেই। আমাদের দেশে আমরা দেখি শহরের রাস্তাঘাটে যানবাহনের মতো মানুষের জ্যাম বাঁধে। কিন্তু যখন প্রকাশ্য দিবালোকে একজন মানুষকে সন্ত্রাসীরা কুপিয়ে হত্যা করে এত মানুষের মধ্যে কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না, যখন সন্ত্রাসীরা চলন্ত বাসে পেট্রল বোমা মেরে জীবন্ত মানুষ পুড়িয়ে মারে, জনাকীর্ণ স্থানে প্রকাশ্যে ককটেল বোমা মেরে আতঙ্ক সৃষ্টি করে এই হাজার হাজার মানুষ তখন সন্ত্রাসীদের ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে পালায়। যখন বখাটে সন্ত্রাসীরা পহেলা বৈশাখের মতো জাতীয় উৎসবে প্রকাশ্যে একজন একজন করে ১৬ জন নারীর শ্লীলতাহানি করে, বিবস্ত্র করে উল্লাস করে তখন এই হাজার হাজার জনতা তাকিয়ে থেকে দেখেই দায়িত্বের ইতি টানে। অসহায়ের আর্তচিৎকার শুনে মাথা নিচু করে পাশ কাটিয়ে যায়। মানুষের প্রধান গুণ যদি হয় মনুষ্যত্ব, তাহলে এই গিজগিজ করা মানুষকে মানুষ বলা সত্যের অপলাপ হবে। মনুষ্যত্বহীন, সহযোগিতা ও সহমর্মিতাহীন স্বার্থের পূজারী এই জনসংখ্যা তাদের নিজ কর্মফল হিসেবে ধ্বংসের প্রহর গুনবে এই তো স্বাভাবিক। মনুষ্যত্বের এই বিপর্যয় কেবল আমাদের দেশেই নয়, সমগ্র পৃথিবীতেই আরও ভয়াবহরূপে বিদ্যমান। মানুষ ট্যাগ ধারণ করে অমানুষের মতো কর্মকাণ্ড চলছে সমস্ত পৃথিবীময়। সাতশ' কোটি মানুষের কর্মফল হিসেবে সমগ্র পৃথিবী এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। পৃথিবী নামের এই গ্রহকে দুমড়ে-মুচড়ে নিঃশেষ করে দেওয়ার মতো অস্ত্র শোভা পাচ্ছে মানুষেরই হাতে। তাদের একটিমাত্র ভুল সিদ্ধান্ত চোখের পলকে সমগ্র পৃথিবীতে ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে আনতে পারে। পৃথিবী থেকে প্রাণের অস্তিত্ব মুছে যেতে পারে চিরতরে। হতে পারে আজই, এই মুহূর্তেই।

এখন প্রশ্ন হলো- আসন্ন ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রেহাই পাবার কোনো উপায় আছে কি?

হ্যাঁ, উপায় আছে। পৃথিবীর ইতিহাস দেখুন। যুগে যুগে মানবজাতি যখন সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ের চূড়ান্ত বিন্দুতে পৌঁছেছে তখন আল্লাহ জরাজীর্ণ, রোগাগ্রস্ত সভ্যতার ধ্বংস করে সত্যের ভিত্তিতে নতুন সভ্যতার সূচনা করেছেন। তিনি তাঁর নিজ মহীমায় তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষের মধ্যে থেকে তাঁর প্রেরিত সত্য ধারণকারী মানুষগুলোকে রক্ষা করেছেন। তাদের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে নতুন সভ্যতা। আজ মানবজাতির ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে সেই নতুন সভ্যতারই আহ্বান জানাচ্ছে আল্লাহর মনোনীত এমাম, এমামুয্‌যামান (The leader of the time) জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন হেযবুত তওহীদ। পৃথিবীর এই ক্রান্তিলগ্নে একমাত্র হেযবুত তওহীদের প্রচারিত সত্যই হতে পারে আপনার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আপনিও হতে পারেন নতুন সভ্যতার অগ্রনায়ক। আল কোর'আনে আল্লাহ তাঁর প্রেরিত রসুলকে বলছেন- আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি (সুরা সাবা ২৮)। তুমি তো একজন সতর্ককারী বৈ আর কিছুই নও (সুরা ফাতের ২৩)। রসুলাল্লাহর উম্মত হিসেবে আমরাও কেবল সতর্ক করতে পারি। এই সতর্কবাণী যারা শুনবেন, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করবেন তাদের জন্য হেযবুত তওহীদ সত্যের দুয়ার উন্মুক্ত করে রেখেছে। এখন কে সৌভাগ্য অর্জন করবেন আর কে সতর্কবাণীকে অগ্রাহ্য করে প্রকৃতির প্রতিশোধে ধ্বংস হয়ে যাবেন সেটা আল্লাহই ভালো জানেন। আল কোর'আনের ভাষায়- একজন চক্ষুস্মান ব্যক্তি ও অন্ধ ব্যক্তি কখনও সমান হতে পারে না। না (কখনো) আঁধার ও আলো (সমান হতে পারে)। ছায়া এবং রোদও তো (সমান নয়)। (একইভাবে) একজন জীবিত মানুষ এবং একজন মৃত মানুষও সমান নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা শোনান, তুমি কখনো এমন মানুষদের কিছু শোনাতে পারবে না যারা কবরের অধিবাসী (হওয়ার মতো ভান করে) (সুরা ফাতের ১৯-২২)।